রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাদিক

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয়্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী স্মরণে

“আমি যে জানি
একথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হোক, সুরে হোক, রেখায় হোক
সে পণ্ডিত।
আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,
একথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হোলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।

পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আজ বাংলাদেশের সকলের। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বা দলবিশেষের নন। সুতরাং তাঁর জীবন, তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে যাঁরা অনুশীলনরত তাঁদের সকলেরই সেইসব বিষয়ে বলবার কথা আছে। তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য দেশের সকলেরই আগ্রহের সঙ্গে শোনা উচিত। কারণ গুরুদেবের বিষয়ে অভ্রান্ত মত বা শেষ কথা বলবার কেউ নেই। বহুলোকের, বহুদিনের অনুশীলনে আলোচনাতেই গুরুদেবের প্রকৃত পরিচয় ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সকলের সামনে। গুরুদেবের সঙ্গীতের বিষয়েও আমি এই মতই পোষণ করি।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গীতের অনুশীলনে নিযুক্ত আছেন। পূর্বের আরেকটি বইয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত রসিকরা তার পরিচয় পেয়েছেন। বর্তমান বইটি তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টার দ্বিতীয় সুফল। বইটি পড়ে আমার পূর্বোক্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরো বলব যে, শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুকাল থেকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতের আবহাওয়ায় শিক্ষিত ও বর্ধিত, বর্তমানে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপিকার কাজে নিযুক্ত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। সঙ্গীত ও সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বছর ধরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত। উভয়েই তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলার অধিকারী। নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদেবের গানকে তাঁরা যেভাবে দেখেছেন বা বুঝেছেন, তা সুন্দর ভাষায় পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। আশা করি পাঠকদের কাছে এই বইটিও তাঁদের প্রথম বইটির মতো সমাদর পাবে।

শান্তিদেব ঘোষ।

বিষয় সূচী :

অবতরণিকা

'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা' নামে আমাদের পূর্ব প্রকাশিত বইটিতে রবীন্দ্রনাথের গানের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। অনুরূপ আরো কয়েকটি প্রবন্ধ এই পুস্তিকায় সংকলিত হল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা জানেন কী বিশাল এর সম্পদ, কী বিচিত্র এর পটভূমি। আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয় সব দিক বিচার করা তো হলই না, যা বলতে চাই তাও প্রকাশ করা হল না। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে কোথায় এর স্থান, সুর প্রয়োগের বৈচিত্র্য, সুরের বিচার বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যের দিক, রূপের দিক, রসের দিক, প্রকাশের বিভিন্ন ধারা—ভেবে দেখতে গেলে সব মিলিয়ে এক বৃহৎ ব্যাপার। তাই গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, আমাদের এই প্রবন্ধগুলি আমাদের কাছে অথবা পাঠকদের কাছে শেষ কথা নয়। আমরা শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রবেশক হিসেবে কয়েকটি দিকের সংকেত দিয়েছি। বলতে গেলে, সামগ্রিক আলোচনা অথবা সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণের গোড়াপত্তন মাত্র করেছি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিচারের প্রধানত দুটি দিক, গানের এবং কথার। কথার দিকে কাব্য, কবিত্ব, রস এবং অর্থ। গানের দিকে সুর, তাল, গাইবার ঢং ইত্যাদি,—এবং এই নিয়েই যত সমস্যা। কেন না, প্রথমত, যিনি গাইবেন তিনি রূপ দিতে গিয়ে গানকে কোন ভঙ্গিতে পরিবেষণ করবেন সেটা তাঁকে চিন্তা করতেই হয়, এবং গায়ন ভঙ্গি ছাড়াও নিজের কায়দায় তার প্রকাশ করবার একটা ঝোঁক এসে পড়ে। গীত পরিবেষণের নানাবিধ চলতি রীতি এবং স্বরলিপির অসাম্য তাঁকে বিভ্রান্ত করে এবং নানান প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে। দ্বিতীয়ত, যিনি গান শোনেন তিনিও এ নিয়ে চিন্তা করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী না হয়েও ভাষার সাহায্যে এবং সুরের ভাবানুগ সাহচর্যে গীতরস আস্বাদনে তাঁর অসুবিধা হয় না। এইজন্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীত—এবং এই জাতীয়

অন্যান্য সঙ্গীত নিয়ে জল্পনা কল্পনার ক্ষেত্র অবাধ। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তার কাব্যাংশের জন্য সুরাশ্রয়ী অনুভূতির রেশ ছাড়াও একটা স্থায়ী উপলব্ধির ছাপ রেখে যায়। এই গুণের জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত, এবং সাধারণভাবে বাংলা গান বুঝতে সহজ। এই সহজতাই সৃষ্টি করেছে নানাবিধ সমস্যার। বিচার বিশ্লেষণ আলোচনা সমালোচনার দ্বারা সেই সমস্যার কিছু সমাধান হতে পারে। সমালোচনার নামে ব্যাপারটা যেন নিছক নিন্দা-প্রশংসার উদ্‌গিরণ বা প্রচার না হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। সুমিত আলোচনা যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার প্রধান সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উচ্চাবচ সব দিকেরই নির্দেশ পাওয়া সম্ভব। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সমীক্ষা প্রয়োজন। সমালোচনার ক্ষেত্রে সুরের খুঁটিনাটি নিয়েও বিবাদ-বিসম্বাদ। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ শিখতে হয় স্বায়ত্ত প্রকাশ ভঙ্গির ভিত্তি হিসেবে, তেমনি গানের ক্ষেত্রে সুর তাল লয় মাত্রা ইত্যাদির যথাযথ ভিত্তি প্রকাশ ভঙ্গিতে মাধুর্য দান করে। সাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন রচনাভঙ্গি এবং মেজাজটুকুই প্রধান, গানের বেলাতেও প্রধান গায়ন ভঙ্গি এবং মেজাজ। তাই কাঠামোর মধ্যে সামান্যতম এদিক-ওদিক বা সূক্ষ্মতম চ্যুতি হলেই চোখ লাল করাটা বাড়াবাড়ি। চারু-শিল্পকে ব্যবচ্ছেদের কায়দায় বিশ্লেষণ করতে গেলে বৈয়াকরণিক সিদ্ধিলাভ হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক রস-মাধুর্যের হয় কৈবল্য প্রাপ্তি,—কায়া থাকে, কিন্তু প্রাণ যায় চলে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তি এবং সুর-সম্ভ্রম বোধ সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ কটিতে আমরা প্রমাণ কিছুই করতে চাই নি। চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথকে—তাঁর মননকে অনুধাবন করবার। আজকাল রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে বোধগম্য করবার জন্য নানারকম কায়দা বার করা হচ্ছে; গানগুলিকে কত রকমারি ভঙ্গিতে সাজানো গোছানো, কত রকম নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি।

অবাঙালী শ্রোতাদের সুবিধার জন্য গানের অনুবাদ করে সেই অনুবাদ গীতি রাবীন্দ্রিক সুরে গাওয়া হচ্ছে। একথা সকলেই মানেন যে কবিতার অনুবাদে কাব্যের সবটুকু ভাবসম্পদ—তার শব্দ মাধুর্য, ধ্বনি চাতুর্য বা মেজাজ রক্ষিত হয় না। কাব্যগীতির বেলায় সেটা আরো কঠিন। যে সব ঝোঁক এবং রঙ নিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অনুবাদ গীতিতে তা থাকে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে অনুবাদ সাপেক্ষ কাব্যাংশ থাকলেও গানের বেলায় বাংলাভাষাতে গাওয়াই বিধেয়, তা নইলে ভাবসম্পদ বা রূপকল্প বজায় থাকবে না। কথার ঢঙে আর সুর প্রয়োগের মধ্যে বাঙালীর মন মাধুর্য এমনভাবে মিশে আছে যে ভাষান্তরেই ভাবান্তর ঘটে। কালোয়াতি গীত-রসিক মহল বাংলায় খেয়াল বরদাস্ত করেন না। এমন কি ভজন গানও হিন্দীতে না হলেই যেন খাপছাড়া। অনুবাদ যদি করতেই হয় তবে শুধুমাত্র ভাবটুকু ক্ষেত্রবিশেষে অন্য ভাষায় বলে দিলেই কাজ হয়। তাছাড়া হিন্দী গান যেমন সকলেই শেখেন, তেমনি ভারতবর্ষের এক প্রদেশের গান অন্য প্রদেশের ভাষা-ভাষীর পক্ষে শিখে নেওয়া এমন কী কঠিন!

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার আদিযুগের এক প্রবাদ থেকে তাঁর একটি উক্তির উল্লেখ করছি।—"ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষার প্রতিরূপ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জীব প্রতিমা নির্মাণ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণ ভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে।" সঙ্গীতের অনুবাদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অভিজাত্য প্রমাণ করবার জন্য মার্গসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের পুরো দখল ছিল এবং সেই আদর্শে তিনি গীতরচনা করেছেন, কেমন ভাবে মার্গসঙ্গীতের সব ধারা এসে মিশেছে রবীন্দ্র-

সঙ্গীতে,—এই জাতীয় যুক্তি-প্রয়োগের কোনো সার্থকতা দেখি না। তাই সুর তালের ঐ জাতীয় খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা যাই নি। আমরা দেখতে বা দেখাতে চেয়েছি রবীন্দ্র-সঙ্গীত কেমন করে ভারতীয় সঙ্গীতের ভাবসম্পদ এবং ভারতীয় ধারার ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করেছে, কোন গুণে তা আমাদের সমাজের ও সংস্কৃতির মজ্জায় মিশে গিয়েছে এবং রুচিগঠনে সহায়তা করেছে, সাহিত্য-সম্পদে ও রূপসৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত কতখানি গরীয়ান্। সঙ্গীতের আলোচনায় একটা দিক ব্যাকরণের, আরেকটা দিক রসের। আমরা রসের দিকটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব সুর সমারোহে যতটা তারও বেশি ভাবব্যঞ্জনায় এবং রূপকল্পনায়। সুরের আকৃতির চেয়ে সুরের প্রকৃতির দিকেই নজর বেশি, কথার গাঁথুনির চেয়ে বেশি ঝোঁক কথার বাণীমাধুর্যে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই তাই গীতশাস্ত্র এবং সাহিত্যতত্ত্ব—দুই রসেরই রসিক হতে হয়।

গীতসৃষ্টি দু রকমের। একটি সুরাশ্রয়ী গানের সুরবিস্তার, অপরটি কথাশ্রয়ী গানের পরিমিত চাল। একটিতে সুরের মেজাজ এবং গাইয়ের কৃতিত্বের মিশ্রণ, অপরটিতে ঐ সঙ্গে গীতস্রষ্টার বৈশিষ্ট্যটুকুও বজায় রাখবার দায়িত্ব। কাব্যগীতির এই অপরিহার্য দ্বিতীয় রীতির জন্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীত তার সমস্ত দিক নিয়ে বিচার ও চর্চার অপেক্ষা রাখে, এবং এই জাতীয় গান স্বভাবতই আমাদের জীবনের ও সমাজের সঙ্গে জড়িত বলেই আলোচনা সমালোচনা ভেবে চিন্তে করতে হয়। কেবলমাত্র সুর নিয়ে যে গানের খেলা সেটা আমাদের জীবনে একটা উপরি পাওনার মতো, আনন্দের অংশ। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাতব্যে এবং বক্তব্যে মিলেমিশে আমাদের জীবনের এক অখণ্ড আনন্দরূপেই প্রকাশিত। একপাশে ঠেলে রাখবার সামগ্রী নয়, জীবনের মধ্যে মিশিয়ে নেবার সম্পদ। তাই, আমাদের মনে হয়েছে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা শুধু সাঙ্গীতিক বা সাহিত্যিক আলোচনাই নয়, জীবন বোধেরই আলোচনা।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যে সব আলোচনা সমালোচনা বাদানুবাদ চলেছে দেখতে পাই তাতে দুটি চিন্তা মনে আসে। এক, রবীন্দ্র-সঙ্গীত কিছুকাল আগের তুলনায় এখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ; দুই, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিয়েছে। একথা ঠিক যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত আজ গাইয়ে এবং শ্রোতা মহলে সেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে যাতে এটিকে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ ধরনের সঙ্গীত হিসাবে স্বীকার করা যায়। কোনো বিশেষ ধরনের বা ঢঙের গানকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য যেমন খেয়াল ঠুংরি টপ্পা বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, তেমনি বিশেষ ধরনের এই বাংলা গানকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ভাষা সুর ভাব ও রূপের মিশ্রণগত একটা স্বতন্ত্র কাঠামো বা চাল এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে যা একক বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে, সন্দেহের সম্ভবত শেষ হয়েছে। কেবলমাত্র বিশেষ মহলে বিশেষ ধরনের শ্রোতার জন্যই যে এই গান সেকথা আজকাল বোধহয় তেমন করে কেউ বলবেন না। বাংলা গানের দরবারে আজকাল প্রচুর গাওয়া হচ্ছে বলেই শুধু এর জনপ্রিয়তা নয়, চলতি বাংলা গানের উপরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অবিসংবাদিত প্রভাবও এই জনপ্রিয়তার নিদর্শন। সাম্প্রতিক বাংলা গান 'আধুনিক' বিশেষণে ভূষিত। 'আধুনিক কথাটা' কালের মাপকাঠিতে গ্রহণ যোগ্য নয় বলে প্রায় সব মহলেই এই বিশেষষটি নিয়ে অসন্তোষ আছে, অথচ কথাটা চলছেও। হিন্দীতে এই ধরনের গান 'গীত' পর্যায়ে পড়ে। 'আধুনিক গানের' পরিবর্তে 'বাংলা গীত' বা 'কাব্যসঙ্গীত' অথবা অন্য কোনো সুষ্ঠু বিশেষণ চালানো যায় কিনা বিবেচ্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কতকগুলি গুণকে স্বীকার বা অস্বীকার, গ্রহণ বা বর্জন করে 'আধুনিক' গাইয়ে সুর বসাবার চেষ্টা করেন। এবং তাঁদের আপাত সাফল্য বা অসাফল্য

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনার মুখ্য অথবা গৌণ হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও দেখা যায়। সহজ কথা স্বচ্ছন্দ সুরের প্রবাহে চললে এত অনায়াসে মনকে আয়ত্ত করে ফেলে যে সেই সরলতাই যে তাকে এত বিরল করে তুলছে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। চণ্ডীদাসের পদাবলী খুবই সহজ এবং সাধারণ, কিন্তু তার অনুকরণ করতে গেলে টের পাই তার অসাধারণত্ব। এই কথাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কেও খাটে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে দুশ্চিন্তা যদি থাকে তবে সেটা বোধহয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার সমস্যা নিয়েই। এবং এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ নিয়ে অজাযুদ্ধ ঋষিশ্রাদ্ধ। এর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধ রাগানুসারী সহজ কথার গানগুলি অথবা লোক-সঙ্গীতাঙ্গের গানগুলি নিয়ে তত সমস্যা নেই, কেননা সেগুলিতে সুর তালাদি বা গায়কী নিয়ে রকমারি চালের তেমন সুযোগ নেই,—সোজা সুর-ছন্দে সোজা ভঙ্গিতেই চলে। এক থাকতে পারে তান বা সুরবিস্তারের প্রশ্ন, তবে সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ। যে জিনিস অবিমিশ্র তা নিয়ে মতভেদের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যেসব গান বিশেষ কোনো রাগ-রাগিণীর পর্যায়ে পড়ে না সেগুলি নিয়ে নানান আলোচনার সূত্রপাত। রাগের ভিত্তি ও মিশ্রণ এসব ক্ষেত্রে এতই সূক্ষ্ম এবং সেই মিশ্রণ এতই ভাবানুষঙ্গী যে মিছরির দানার মতো সুরের সুতোর এই বাঁধন, ভাস্কর্য শিল্পের মতো সূক্ষ্ম রাগের তারের এই কাঠামো আছে কি নেই বোঝাই যায় না। তাই সুর নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে, গানের ধরন নিয়ে পাঁচমিশেলি মতামতের ফাঁক থাকে।

এখন, সমস্যার স্বরূপ কি দেখা যাক। এর মধ্যে রয়েছে গাইয়েদের নানান ঢঙের গীতরীতি, শ্রোতাদের রকমারি ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কাহিনী, শিক্ষার সমস্যা, স্বরলিপির প্রসঙ্গ। গাইয়েদের নানান ধরনের গীতরীতির প্রসঙ্গে তানবিস্তারের কথা মনে পড়ে।

ওস্তাদ গাইয়ে গানের রাগরূপকে প্রাধান্য দিয়ে বাণীরূপের মেজাজকে গৌণ করেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীরা সুর নিয়ে সেরকম খেলা না করলেও অনেকেই ছোটখাট কসরত করেন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে বাণীরূপ সহজ বোধ্য বলে সুরের মর্মরূপ অবহেলিত হবার আশঙ্কা থাকে। কথার উপরে অতিরিক্ত আবেগের ভঙ্গি নিয়ে এসে সুরের মধ্য দিয়ে যদৃচ্ছ মেজাজ প্রকাশের চেষ্টাও দেখা যায়। কেউ বলেন সুরের বিশুদ্ধিই প্রধান, কেউ বা বলেন বাণীর অন্তর্নিহিত ভাব ফুটিয়ে তোলাই প্রধান। অথচ একথা সত্য যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরই ভাবপ্রকাশের যথাযথ বাহন, তার জন্য খুব একটা কসরতের প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত ভঙ্গির কথা মেনে নিয়েও স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ যে একটি ঢং বা ধরন বা চাল আছে সেইটিই প্রধান। কী সে ঢং তা আলোচনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। চাঁদের চারপাশে যে একটা আভা থাকে, কোনো বিশেষ উক্তিকে ঘিরে যেমন একটা অব্যক্ত বোধিসঞ্জাত অর্থ থাকে, এও ঠিক তেমনি। রবীন্দ্র-গীতরুচি। চর্চার ফলে এর উপলব্ধি হয়, কান থেকে সোজা হৃদয়ে এর অভ্যুদয়। উচ্চারণ থেকে শুরু করে কণ্ঠক্ষেপ পর্যন্ত রীতি-বৈশিষ্ট্যের ফলে এর প্রকাশ স্বতস্ফূর্ত। অযথা আবেগের বাষ্পাবরণে সুরকে আচ্ছন্ন করবার দরকার হয় না।

শ্রোতাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগাও আবার বহুলাংশেই গীতপরিবেশকের ব্যক্তিগত নির্বাচন সাপেক্ষ—যত না রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাবানুষঙ্গনির্ভর। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূল রসের চেয়ে পরিবেশক প্রীতিই প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলায় কবির ব্যক্তিত্ব বা গীতরুচিও অস্বীকার করবার নয়। ব্যক্তিগত মেজাজের মাপে কোনো গান কখনো ভালো লাগে কখনো বা ভালো লাগে না, কোনো বিশেষ কণ্ঠের উপরে পক্ষপাতিত্ব থাকাও সম্ভব, কিন্তু তার জন্য গানের

অন্তর্নিহিত রস বাড়ে না বা কমে না। গাইয়েদের নিজ নিজ গীত বৈশিষ্ট্য এবং শ্রোতাদের নিজ নিজ শ্রবণস্বাতন্ত্র্য থাকবেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সবার উপরে থাকবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব সম্পর্কে চেতনা। এই বিশেষত্ব কথা ও সুরের বিবাহবন্ধন বলে যদি মেনে নেই, তাহলে ভাবপ্রকাশের বারো-আনাই বজায় রইল। বাকি থাকল শুধু স্বরশুদ্ধি, স্বরসমতা, উচ্চারণাদির সৌষ্ঠব, মাত্রাজ্ঞান ও লয়বোধ ইত্যাদি। তারপরেও গাইয়ের একটা স্বকীয়তা থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রকাশ সংযত না হলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসল রূপটি ফুটে উঠবে না। শ্রোতাদের মধ্যেও একটা সংযম প্রয়োজন। বিশ্লেষণাত্মক মন ভালো, তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিও মন্দ নয়, কিন্তু তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন না হলে বিচার বিশ্লেষণের দিকেই মন ঝোঁকে—গানের বেলায় যেটা খুব তৃপ্তিকর নয়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার পদ্ধতি যেন ক্লান্তিকর ব্যাপার না হয়ে ওঠে সেটাও শিক্ষকদের দেখা উচিত। সাধারণত শিক্ষক এসে হারমনিয়মের সাহায্যে গান শিখিয়ে যান এবং শিক্ষার্থী যৎশ্রুতম্ তদ্ গীতং অবস্থায় গান তুলে যায়। হারমনিয়মের সহায়তা নিতে গেলে গলা যে এই যন্ত্রেরই বশ হয়ে পড়ে এবং শ্রুতি মীড় ইত্যাদি অনেক কিছুর কাজই যে এতে চলে না এটা কারো অবিদিত নেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার কাজ তানপুরা সহযোগে এবং এসরাজ জাতীয় তারযন্ত্রের সহায়তায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। গায়ন পদ্ধতির ব্যাপারেও রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তনগুলির বিভিন্ন ঢং দেখা যায়। এর ফলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপরে আরো দুটো ছাপ পড়ে যায়, ব্যক্তির ছাপ এবং প্রতিষ্ঠানের ছাপ। আপাত দৃষ্টিতে এতে হয়তো বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরিণামে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানার উৎপত্তি হবে না একথা কে বলতে পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষণের বেশ বড়সড় এবং ছোটখাট বহু প্রতিষ্ঠান আছে, ব্যক্তিবিশেষ প্রচুরতর। এই সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষক

এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে যদি একটা কেন্দ্রীয় সংস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে শিক্ষার ব্যাপারটা এক ধাঁচের হাতে পারে এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন ভঙ্গিমুখীনতাকে একটি বিশেষ রাবীন্দ্রিক খাতে বইয়ে নেওয়া যায়। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে শিক্ষকদের মান-নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং সঙ্গীত শিক্ষার সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যাপারটাও এই কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে পরিচালিত হতে পারে। এই ব্যবস্থা সম্ভব হলে অনেক দ্বন্দ্বেরই নিবৃত্তি হত সন্দেহ নেই।

আলোচনার সূত্রে স্বরলিপির প্রসঙ্গও উপেক্ষণীয় নয়, কেননা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি নিয়ে অনেক গোলমালের সূত্রপাত। স্বরলিপি অভিজ্ঞ গায়ককে প্রায় সব কিছুরই নির্দেশ দেয়। গায়ক শুধু তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। কথাটা বলতে সহজ কিন্তু কার্যত সহজ নয়। কেননা, এই প্রাণ সঞ্চার করবার ক্ষমতার উপরেই গাইয়ের সাফল্য নির্ভর করে। সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। কিন্তু আজকাল অনিবার্য কতকগুলি কারণে এই গুরুমুখিতা অটুট রাখা সম্ভব হয় না। সাহিত্যের মতো সঙ্গীতও আমাদের আংশিক শিল্পচিন্তা বা শিল্পকৃতি। সুতরাং স্বরলিপির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে,—বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশাল সংখ্যানুপাতে। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপির অবিশ্বাস্য বিবর্তনে বিভ্রান্ত গায়কশ্রেণী এবং শ্রোতৃবর্গ এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। প্রতিষ্ঠিত গায়ক-গায়িকারা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেমন বিব্রত বোধ করছেন তেমনি নূতন গাইয়েরা হয়ে উঠছেন বেপরোয়া। রেকর্ডে বা রেডিয়োতে প্রচারিত গানের সঙ্গে সেগুলির স্বরলিপির বিভেদ দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্র-পরিবেশের মধ্যে থেকে যাঁরা গান শিখেছেন তাঁদের সকলেরই যে তৎকালে প্রচলিত সব রকম সুর হুবহু স্মরণ থাকবে এমন কথা যদি আমরা নাও স্বীকার করি তবুও স্বরলিপির সঙ্গে এমন আকাশ-পাতাল তফাত কেন হবে তাও বুঝতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রচারিত স্বরলিপির সঙ্গে যখন অধুনাতন

প্রকাশিত স্বরলিপির প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় তখন স্বভাবতই মনে সংশয় জাগে।

আমাদের এই পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমরা কোনো বাদানুবাদের অংশীদার হতে চাই নি। অনেক ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন মনে এসেছে তার উল্লেখ করেছি এবং সেসব বিষয়ে আমাদের যা মনে হয়েছে তাও লিপিবদ্ধ করেছি। যদি কোথাও বিরূপ মন্তব্য, অনাবশ্যক সমালোচনা অথবা বাক-বিতণ্ডার সূত্রপাত করে থাকি তবে তা অনিচ্ছাবশতই হয়েছে। পাঠকবর্গ এসবের মধ্যে থেকে নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নেবেন বলেই বিশ্বাস করি। রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পর কুড়ি বছর পার হতে না হতেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে সাঙ্গীতিক মহলে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফল আমাদের সকলের পক্ষে ভালো হবে বলেই মনে করা যায়। কেননা, প্রথমত, যে শিল্পসৃষ্টি নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তার সামাজিক মূল্য এবং জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই সব আলোচনা সমালোচনার ফলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দিকনির্ণয় সহজেই হবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বভাবমত যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে গোষ্ঠীগত করে রাখতে চান তাঁদের প্রয়াসে বাধা পড়বে এবং রবীন্দ্রগোষ্ঠী ব্যাপ্ততর হবে, সর্বজনীন হয়ে উঠবে। তৃতীয়ত, রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তাধারার সার্বিক জরিপ হবে, সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে, রুচিবোধ জন্ম নেবে। এই রুচিবোধ থেকে আমাদের চিন্তাধারার মান উন্নত হবে, রসবোধ সূক্ষ্মতর হবে, জীবনযাত্রা হবে আনন্দময়। সেই আশা নিয়েই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলি রসিক জনের কাছে নিবেদন করতে সাহসী হয়েছি।

একথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় যে প্রথম কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল বাল্মীকির কণ্ঠে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিয়োগ-জনিত ব্যথার উপলব্ধিতে, তাহলে কবিতাকে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ বলেই স্বীকার করতে হবে। তবে সেই অনুভূতি নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তার সঙ্গে বিশ্বের ভাবগত যোগ। তা নইলে ছেলের জন্য মায়ের কান্না কিম্বা রোগের আক্রমণে রোগীর বিলাপকেও সাহিত্যের সামগ্রী বলতে হয়। কিন্তু এই কান্না বা বিলাপ যদি একটি মায়ের বা একটি রোগীর অনুভূতির প্রকাশ না হয়ে বিশ্বজননী বা রোগীমাত্রেরই অনুভূতির সঙ্গে এক হয়ে মিলে যেতে পারে তবে তা সাহিত্যের উপলব্ধির সত্য হতে পারে। ক্রৌঞ্চ-বিরহ বাল্মীকির মনে বিরহের অনুভূতিতে একাত্ম হল বলেই কাব্য-সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠল। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হয় সাহিত্য। সেই বোধি-সঞ্জাত সাহিত্য বাস্তবকেও অনাবশ্যক মনে করে না, কল্পনাকেও অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় না। বাস্তবকে ভিত্তি করে কল্পনার রং চড়ায়, কল্পনাকে অবলম্বন করে বাস্তবের রাস্তায় পা-বাড়ায়। এই কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জগৎ অবশ্যই আছে,— কখনো প্রচ্ছন্ন ভাবে, কখনো বা প্রকাশ্যে।

কবিতার ক্ষেত্রে কবির অনুভূতির জগতেও এই ব্যক্তিমানসের প্রকাশ। বিশেষ করে গীতিকবিতার বেলায়। কারণ বস্তুনিষ্ঠ কবিতার মধ্যে বাস্তবের যে সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠতে পারে, বস্তুনিরপেক্ষ কবিতায় তা হয় না। তবু অন্তরের দৃশ্যপটে বিশ্ব প্রতিফলিত হয়। গীতিকাব্য তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েও বিশ্বরসে অভিষিক্ত। গীতিকবিতা কবির নিজের মনের প্রতিধ্বনি। সেই

মন বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত। বাস্তব থেকে দূরে গিয়ে উপলব্ধির এক অন্য জগতে আনাগোনা কবিতার। সেখানে বস্তু আছে নীহারিকাপুঞ্জের মত অনুভূতির আকাশে, আর তার চারদিকে ঠিকরে পড়ছে মননশীলতার জ্যোতি। ক্লাসিকেল বা সনাতন ধারার গণ্ডি থেকে একদিন বেরিয়ে এল রোমান্টিক ধারা, বাস্তবে আর কল্পনায় মিশ খেয়ে গেল। কবির ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের ব্যক্তিসত্তায়। তারপরে আরো দূরে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন যে সব কবি সেখানে মরমিয়া রহস্যের আনাগোনা। কবিতা হল মিস্টিক।

রোমান্টিক কবিমানস কি ভাবে পরিণামে গিয়ে মিস্টিক হয়ে যেতে পারে সে কথা ভেবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই পরিণতি স্বতঃসিদ্ধ না হলেও স্বাভাবিক। রোমান্টিক কবি নিজের পরিচিত জগৎ নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে নিজের রচিত আরেক পরিপূর্ণ জগতের কল্পনায় তৃপ্তি পান। তাঁর রচিত জগৎ তাঁর কাছে সত্য হয়ে ওঠে, এবং সেই সত্যের আলোয় তিনি পরিচিত জগৎকে পূর্ণতর দেখেন বা দেখতে চান। তখন সব কিছুই তাঁর কাছে একটা নূতন অর্থ নিয়ে দেখা দেয়। অথচ তাঁর অন্তরের আকুতির শেষ হয় না, চরম তৃপ্তি আসে না, কিসের যেন একটা অভাববোধ তাঁকে অস্থির করে রাখে। তার ফলে তিনি যেন জানা থেকে অজানায়, সীমা থেকে অসীমের দিকে চলতে থাকেন। নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসের মধ্যেও অসামান্যের আভাস পেয়ে রোমান্টিক কবি সেই অপূর্ব অদ্ভুত রসে মগ্ন থাকেন, অথচ তাঁর মনোনীতাকে কখনোই পান না, অভিলাষ রূপ পায় না,—তাই তাঁর কাব্যে অতিপ্রাকৃত আশা, অভিনব কল্পনা, হতাশা ও বিষাদের সুর থাকে। তবু সেই রূপ-রসের অভিব্যক্তি আমাদের ভাল লাগে, কেন না অপূর্ণতার ব্যথা এবং পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলেরই মনে পাশাপাশি বিদ্যমান। সেই জন্যই রিয়েলিজ্‌ম বা বাস্তবতার সঙ্গে

রোমান্টিসিজম বা রূপকল্পতার একটা আপাতবিরোধ থেকে যায়। বাস্তবের জগৎ আর কল্পনার জগতে মেশামিশি হয়ে যেতে চায়, অথচ এক হয়ে যায় না। বাস্তবকে কল্পনার জগতের দিকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, আবার কল্পলোক রূপ পেতে চায় বাস্তবে। 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, গন্ধ সে চায় ধূপেরে রহিতে জুড়ে।'

রোমান্টিক কবি যখন মিস্টিক দৃষ্টি লাভ করেন তখন আর বস্তু-গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। তখন রূপলোকের মধ্যেও অরূপের উপলব্ধি হয়, সীমার মাঝে অসীমের দেখা মেলে। আবার অরূপ বা অসীমকে রূপায়িত বা সীমিত করে দেখাও সম্ভব হয়। তখন নিজের বুদ্ধি, অনুভূতি, স্বপ্ন, আকাঙ্খা —সব এক প্রশান্তিতে ঘিরে আসে। এবং হৃদয়ের আলোতে সব কিছু দীপ্তি পায়। মিস্টিক কবির মধ্যে রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ি থাকে না, বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল দূরত্ববোধও থাকে'না। কেন না বাস্তবকে এক নূতন রহস্যের আলোয় মরমিয়া রসের ধারায় উপলব্ধি করে নিয়ে তাকে কবি গ্রহণ করেন। কোনরকমের মোহ সেখানে বাধার সৃষ্টি করে না। প্রেমের আধারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ এক সঙ্গে ধরা দেয়। এই মিস্টিক প্রেমধারা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দিয়ে বোঝবার জিনিস এ নয়। যুক্তি বা তত্ত্ব দিয়ে বোঝবার চেষ্টা দার্শনিক, আবেগের নেশায় বিভোর হয়ে অজানাকে অনুভব করা রোমান্টিক, হৃদয় দিয়ে জানা-অজানায় একাত্মতার উপলব্ধি মিস্টিক। তাই মিস্টিক ধারা বা মরমিয়া রসকে দৈব বা ঐশীভাব বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মরমিয়া সাধকদের সাধনার যে ধারা তা আধ্যাত্মিক। কিন্তু মিষ্টি-সিজম মানেই আধ্যাত্মিকতা নয়। বৈষ্ণবকাব্যের যে রোমান্টিক প্রেম কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতায় ভগবানের উপলব্ধিতে মিস্টিক হয়ে উঠেছে তারও মূলে যেমন মানবীয় ধারা রয়েছে, তেমনি রয়েছে

অন্যান্য রোমান্টিক কাব্যেও। অর্থাৎ নিছক যে রূপের পূজা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রেম, তাতে কবির মন তৃপ্ত হয় না; তৃপ্তির সিঁড়ি বেয়ে লৌকিক প্রেম ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের অনুভূতিতে উঠে শেষে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় রসে লীন হয়ে যায়।

সেই হৃদয়োৎসারিত বন্ধনমুক্ত প্রেম ভগবৎ প্রেমেরই সামিল। তাই মিস্টিক কবি ঐশী ভাবাপন্ন। কিন্তু বাস্তব থেকে বিযুক্ত নন। হৃদয়ের সহজ প্রকাশের ভাষাকে সহজভাবে যদি দেখি তাহলে মিস্টিক কবিতা বা গান অন্য স্তরের মনে হলেও অন্য জগতের মনে হবে না। অনেক সময়ে দেখা যায় মিস্টিক কাব্য বা গান— তা সে সুফিদেরই হোক বা বাউলেরই হোক—প্রতীক বা রূপকধর্মী কথায় ভরা। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় বা গানে এই ধরণের শব্দচয়ন আছে সন্দেহ নেই। কাব্য মাত্রেই একটা রূপক অর্থ প্রকাশ করে, শব্দগুলির সহজ মানে দিয়েই বক্তব্য নয়—বাক্যের অতীত কিছু অর্থ থাকে কবিতার মধ্যে। সামান্য দিয়ে বিশেষকে কিংবা বিশেষ দিয়ে নির্বিশেষকে প্রকাশ করা। তার সুর আধ্যাত্মিক হতে পারে, তবে মানবীয় আবেদনও তার মধ্যে মিশে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের মরমিয়া সুর ঐশ্বরিক না হয়ে বেশি মাত্রায় মানবিক। তিনি এই পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, মানুষকেই বেশি ভালোবেসেছেন। তাই তিনি বারবার মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা, মানুষের প্রেমের জন্য ভগবানের প্রেমাভিসার দেখেছেন। পরম লীলাময়ের জন্য মানুষের আকুলতার মধ্য দিয়েই ভগবানেরও একই আকুলতার উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। নিজের মধ্যে যে আরেক মানুষ, তাকে আমরা জীবাত্মাই বলি বা আর যা-ই বলি না কেন, সে অন্তরতমের জন্য বা পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল। কোন কোন সাধক অন্তরস্থ এই 'আমি'কে নারীরূপে কল্পনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

'একী কৌতুক নিত্যনূতন, ওগো কৌতুকময়ী।'

'আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে,
কোন বিরহিনী নারী,
আপন করিতে চাহিনু তাহারে
কিছুতেই নাহি পারি।'

এই আকুলতা রোমান্টিক হয়েও মিস্টিক। সে জানেনা যাকে চায় কী তার রূপ। শুধু বলে, 'অজানারে কবে আপন করিব'; বলে, 'আমি যে তোমারে খুঁজি।' রোমান্টিক চঞ্চলতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি হয়,—

'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘুর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্য-পানে।'

এই স্বর্ণকমলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অবশ্যই করা যায়। কিন্তু একে যদি আমরা কবির মিস্টিক অনুভূতি বলি, যদি বলি মানসিক উচ্ছ্বাস বা প্রাণচাঞ্চল্যের মাঝেও পরম সত্তার উপলব্ধির স্থৈর্য কবির মনকে ফুলের মতো অম্লান ঊর্ধ্বমুখী করে রাখে এবং সীমাস্বপ্ন থেকে অসীম আনন্দের দিকে নিয়ে যায়, তবে আর অনর্থক আলোচনা দিয়ে বোঝবার প্রয়োজন হয় না, এক অদ্বয় উপলব্ধিতে মন ভরে ওঠে। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই, মিস্টিক কবিতার সাংকেতিক অর্থ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কথার যে সহজ অর্থ তার রসেও মন অনায়াসেই মগ্ন হয়ে ওঠে। সাধারণ থেকে অসাধারণে, আবার গূঢ়তম থেকে সহজতায় এর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা।

'জীবন-স্মৃতি'তে দেখি আঠারো উনিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র অনুভূতির বিবরণ।—'সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া

শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।'

এই অনুভূতি পুরোপুরি রোমান্টিক অনুভূতি। এর পরেই তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা লেখেন। অনুভূতির তীব্রতায় বিষাদে, চঞ্চলতায়, আনন্দে হৃদয় আন্দোলিত। এই অনুভূতিতেই বলেন,

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

এই থেকেই আরেক ধরণের উপলব্ধির আভাষ,—'এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।' রোমান্টিক-মিস্টিক এই দৃষ্টি আরেকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল এইভাবে—

'শান্ত মৌন নগরীর সুপ্ত হর্ম্য শিরে
হেরিনু জ্বলিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।
ভূত ভাবী বর্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদ স্নিগ্ধ আনন্দ পুলকে

আমার অন্তরতলে ; অনির্বচনীয়
সে মুহূর্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌন মূক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কী অনলে উজ্জ্বলিল।'

এই ভাবেই একটা অখণ্ড দৃষ্টি লাভ করলেন তিনি।—'যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য , তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য তাহাই আনন্দ।' এই সূত্রেই আবার বলেছেন, 'এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।...তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, ...সেদিন দেখেছিলুম বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। ...স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময়ের যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।'

মিস্টিক অনুভূতি তীব্র প্রশান্তিতে মন ভরে দেয়, এক অখণ্ড আনন্দলোকে নিয়ে যায় মনকে। তাই কথার বাহুল্য থাকে না, বাগর্থের বাড়াবাড়িও থাকে না। উপলব্ধির ভাষায় কারিগরি নেই আছে আত্মনিবেদনের ঋজু সুর। কবিতার চেয়ে গানেই তার প্রকাশ সহজ, সুন্দর। সঙ্গীতকে শুধু সুরের খেলা না বলে আমরা বলতে পারি ভাবের লীলা। এবং যেহেতু মিস্টিক রস ভাব-নির্ভর, হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ, সেহেতু গানই তার উপযুক্ত ভঙ্গি। কবিতার মধ্যে কথার চাতুরী বা অর্থ-মাধুরী থাকবেই, কিন্তু গানে শুধু অনুভূতির ছোঁয়া, উপলব্ধির প্রশান্তি। রবীন্দ্র-

নাথের মিস্টিক মন প্রকৃতি, মানব, ভগবান—সব কিছুর মধ্যে এক সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের চেতনা, আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তা দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিকের যুক্তি দ্বারা নয়। ···একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব একসঙ্গে মিলে যেতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়।'

এই প্রেম-দৃষ্টি দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব-করা রস রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় সুরে পূর্ণ হয়ে আছে। ঋতুর পর্যায়ে পর্যায়ে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন পূর্ণরূপে। তার একদিকে প্রকৃতির বস্তুসত্তা অন্যদিকে ভাবসত্তা। বস্তুকে বাদ দিয়ে ভাব নয়। রোমান্টিক রস যদি বা বস্তুর অতীত কল্পনায় বিচরণ করতে পারে, কিন্তু মিস্টিক রস তাকে অস্বীকার করতে পারে না কিছুতে। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়াতীত রূপোপলব্ধি মিলে মিশে থাকে মিস্টিক গানে।

'অসীম কালের যে হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন-দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

প্রকৃতিকে নানারূপে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। গানে গানে কখনো তার উজ্জ্বল উচ্ছল রূপ প্রকাশ করেছেন, কখনো প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সহজ সংযোগের কথা বলেছেন, কখনো বা ঋতুর

মধ্যে অখণ্ড এক মূর্তির কল্পনা করেছেন। আবার এমনি করেই সুরের পথ ধরে তিনি মিস্টিক হয়ে গিয়েছেন।—

'বাঁধন-হারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন পথের বাণী যায় যে বলে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিনীর কুঞ্জবনে।'

রবীন্দ্রনাথের মরমিয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হয়েছে দুভাবে। কখনো তাঁর যাত্রা জানা থেকে অজানা, সীমা থেকে অসীমের দিকে, আবার কখনো অসীম থেকে সীমা, অজানা থেকে জানায় তাঁর নেত্রপাত।

'যে আমি ওই ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশ তলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।

ধূলার সাথে, জলের সাথে,
ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চলছে ওযে ধেয়ে॥

ওযে সদাই বাইরে আছে,
দুঃখে সুখে নিত্য নাচে—
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে।

একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে,
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥

যে আমি যায় কেঁদে হেসে
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে

ওযে সচল ছবির মতো,
আমি নীরব কবির মতো—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
এই যে আমি ওই আমি নই,
আপন মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরনধারা বেয়ে
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি।
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥"

মরমিয়া রসের রসিক যে সাধক, তিনি সৃষ্টির মধ্যে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের অখণ্ড লীলা উপলব্ধি করেন। কিন্তু সেই লীলারসের সাধনায় মরমিয়া সাধক আত্মমুক্তির একটা স্বকীয় আধ্যাত্মিক মার্গ অবলম্বন করেন। তাই সহজিয়া রসের পথিক, বাউল গানের সাধক, সকলের মধ্যে গুহ্য তত্ত্বের বাণীর প্রকাশ দেখি, বিশেষ এক ইঙ্গিত যার বৈশিষ্ট্য। 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়' বললে তাঁরা দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থান বুঝবেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও এরকম অংশ নেই তা নয়। 'কূলহারা কোন রসের সরোবরে, মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে' বললে একেবারে চর্যাগীতির তত্ত্বাভাস এসে পড়তে পারে। তবু মরমিয়া সাধকদের থেকে রবীন্দ্রনাথের মরমিয়া তত্ত্বের রূপ ভিন্ন ধরণের। আধ্যাত্মিকতা এর ভিত্তি সন্দেহ নেই। এবং রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসারতা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনি আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই, সেইরকম করে যখন পাই তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর-আনন্দরূপ।' পদ্মা নদীর উপরে নৌকোয় থাকাকালীনও রবীন্দ্র-নাথের একদিন উপলব্ধি হয়েছিল, 'দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে

'সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে, তাদের মধ্য দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী সর্বানুভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা।... এতকাল নিজের জীবনে সুখ দুঃখের যে সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেচে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।'

এই অনুভূতিই মিস্টিক অনুভূতি। আধ্যাত্মমার্গের পথিকদের মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর মিস্টিক অনুভূতিকে শুধু তত্ত্বের বা ধর্মবোধের সামগ্রী করে রাখেন নি। এক আনন্দলোকে বসে তিনি তার সমগ্র রস আস্বাদন করেছেন, এবং তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতামোদীকেও সেই আনন্দলোকে নিয়ে গিয়েছেন। পরিপূর্ণ প্রেমের উপলব্ধি ভগবানের উপলব্ধির সামিল। সেই প্রেম পৃথিবীর হয়েও পার্থিব কামনা-বাসনা বর্জিত। অপরদিকে ভগবানের কাছে আত্ম নিবেদনের জন্য যেন মানুষ অনন্তকাল ধরে চলেছে, আর ভগবানও মানুষকে ভালবেসে ধরা দিতে আসছেন। অসীমের উদ্দেশে অনন্তযাত্রার মধ্যে একটা রোমান্টিক ভঙ্গি আছে। কিন্তু অসীমের শান্ত অনুভূতি আপনাতে আপনি পূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিমন যেমন বলেন,—

'সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।'

'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।'

"এই যে তুমি" এই কথাটি বলব আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন জলে গ'লে।'

তেমনি আবার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে নিয়ে কবি বলেন,—
'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।'

'আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।'

'আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।'

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।'

পথ সেই একটাই। কখনো 'আমি' সেখানে দিয়ে ছুটে চলি 'তুমি'র দিকে, কখনো 'তুমি' ফিরে এসে তুলে নাও 'আমি'কে। এই 'আমি' সীমা, আমি জানা, আমি অন্ত; আর 'তুমি' অসীম, 'তুমি' অজানা, 'তুমি' অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক গানে সত্তার এমনই অখণ্ড রূপ। 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে।' জীবন ও মৃত্যুর রূপকেও এমনই সহজ মরমিয়া ভঙ্গিতে তিনি দেখেছেন। মৃত্যুর মধ্যে লীন হয়ে জীবন আবার নূতন হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ অন্য ভাবে দেখতে গেলে মৃত্যু বলে শেষতম কোন ছেদ নেই। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

মিস্টিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে এক অখণ্ড সত্তার মধ্যে দেখেছেন। তাই 'মানবের মাঝে' তিনি 'বরষার রূপ' দেখেন, নিজের মধ্যে লীলাময়ের মধুর প্রকাশ অনুভব করেন। উপলব্ধি করেন,—

'আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে তোমার আমা মেলা;
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে তোমার আমার খেলা।'

অনুভব করেন,—

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।'

গানের মধ্য দিয়ে বলেন,—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক মন মানুষকে কেন্দ্র করে মানুষেরই মধ্যে লীলাময়ের লীলা অনুভব করে আনন্দে বিভোর। এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি—তা সে ভগবানেরই হোক বা চিরনূতন, চির-আনন্দময়, পরম শক্তিমান কোনো সত্তারই হোক—সেই নেশাতেই তিনি শিশুর মতো বিভোর। ভগবানকে মানুষ রূপে কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে লীলাখেলা নয়, মানুষের মধ্যে তত্ত্বরসের ইঙ্গিত এনে বন্ধনমুক্তির সাধনা নয়, এ হল সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে লীলাময়ের রসবৈচিত্র্যের আস্বাদনের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়,—'আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম, আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।'

'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন-মনে আমারি পটে আঁকে মানস ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখ মোরে কেমনে কব,
আপন-মনে মেঘস্বপন আপনি রচ রবি।'

নিজের মধ্যে লীলাময়ের এমনই অসীম রহস্যভরা প্রকাশের আনন্দ।—

'তার অন্ত নাইগো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অনু-পরমানু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।'

রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক গানগুলিকে নানান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। বহিঃপ্রকৃতির রূপ রস আনন্দস্বরূপ নিয়ে কখনো তিনি মশগুল, আবার কখনো সেই প্রাকৃতিক বিকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ সত্তার আবির্ভাব তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের বহু গানের মর্মরূপ। যেমন, 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি, কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী,' 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে, সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের পরে নাচে,' 'আজি শ্রাবণঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, নিশার মত নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে,' 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে, আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে,' 'শরত-আলোর কমল বনে বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে,' 'এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে দেখা পেলেম ফাল্গুনে', 'কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়,' 'সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া,' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি যেন ঋতুতে ঋতুতে নূতন বেশে নূতন রূপে এই পৃথিবীর পথে পথে পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে আর দোলা দিচ্ছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। প্রকৃতির সেই সর্বব্যাপী আনন্দরূপ সারা বিশ্বে আনন্দের তরঙ্গ তুলছে। মিলনে বিরহে সে পূর্ণ লীলাময়;—শুধু বহির্বিশ্বেই নয়, আমাদের অন্তর-জগতেও।

মানুষের মধ্যে চিরলীলাময়ের লীলার প্রকাশ-মাধুরী তাঁর মিস্টিক গানের আরেক রূপ। যেমন, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায়

বিহারো,' 'কত অজানারে জানাইলে তুমি,' 'সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে,' 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,' 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে,' ইত্যাদি। এই সব গানের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবির এই 'আমি' বিশ্বের সব 'আমি'র প্রতীক। তাই তাঁর আনন্দ, তাঁর উপলব্ধি সর্বজনীন হয়ে ওঠে। আবার 'আনন্দের বারতা' যায় 'অনন্তের মাঝে'। গানের মধ্যে বিশেষ করে তা হয়, মন থেকে সুদূরে আবার সুদূর থেকে মনে এই আনাগোনা, কেননা সব বক্তব্যের সারটুকু নিয়েই গান,—সারটুকু নিয়েই সুর। তাই তাঁর নিজের কথা নিজের গান প্রেমসম্পদে হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের গান, বিশ্বজগতের সুর। নিজের দেবতাই মানব দেবতা, জীবনদেবতাই বিশ্বদেব। নিজের প্রেমের অনুভূতি সকল মানুষের প্রেমানুভূতি হয়ে পরম শক্তিমানের প্রেমে ভরপূর হয়ে ওঠে, যখন বলেন,—

'ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।'

কিম্বা,—

'আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে—
যত তোমায় ডাকি আমার আপন হৃদয় জাগে।'

খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি যেমন হয় তেমনি অখণ্ডকেও খণ্ড খণ্ড করে অথচ পূর্ণ করে দেখা সম্ভব হয়।

'তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমার চিরনূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চির সুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে।'

অখণ্ড দৃষ্টিতে শেষ বলে কিছু আর থাকে না। আরম্ভ আর সমাপ্তি দুইই এক ধারাবাহিকতার মধ্যে বিধৃত।

'শেষের মধ্যে অশেষ আছে
এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।'

মিস্টিক গানের সব কথা, সব ভাবনা, সব সুর অন্তরের একেবারে অন্তস্থল থেকে তাঁকেই ঘিরে বেজে ওঠে যিনি অন্তর বাহির জুড়ে চিরব্যাপ্ত, চিরজাগ্রত। হৃদয়ের ভাব ভাষা আর সুরের দ্বন্দ্ব মুছিয়ে দেয়, স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক গানের সুর নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাব প্রকাশ করে যে সুরমাধুর্য, তাঁর মিস্টিক গানেও ঐ একই প্রকাশের সার্থকতা। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি বেয়ে মিস্টিক হয়ে গেছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। তার পরে এই গানকে ঘিরে থাকে শুধু ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যময় পাওয়ার উপলব্ধি।

'আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে।'

রবীন্দ্র-নাটকে নৃত্য ও গীত

সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার অনেক আগে থেকেই,—একেবারে মানুষের সেই আদিম যুগে যখন আদি মানব তার সঙ্গীসাথীদের কাছে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে চেয়েছে,—তখন থেকেই মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে তিনটি উপায়ে। গান, নাচ, অভিনয়। এর মধ্যে কোনটা আগে কোনটা পরে বলা বড় কঠিন। তবে নাচটাই বোধহয় আদিমতম। মনের আনন্দ, নিরানন্দ, ভয় বা ইচ্ছে স্বভাবতই অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। আদিম মানুষ নিশ্চয় দেহসর্বস্ব ছিল। মনের জড়তা কাটিয়ে উঠতে তার নিঃসন্দেহে সময় লেগেছে। ক্রমে ক্রমে কোনও ঘটনা যথাযথ নকল করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অভিনয়ের। তারপরে অনুভূতি সূক্ষ্মতর হয়ে রূপ নিয়েছে গীতব্যঞ্জনায়।

আজকের মানুষের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। তারা কথায় কথায় নেচে ওঠে না। বিবেচনা করে নাচে, গায়, অভিনয় করে। বিখ্যাত ইংরেজ কবি বলেছেন জীবনটা যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়। আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সূত্র ধরে বলতে পারি, রঙ্গমঞ্চেও জীবনেরই অভিনয়। সেকালেও অভিনয়ের মধ্যে জীবন প্রতিফলিত হত, একালেও তাই। তফাত শুধু উদ্দামতার আর সূক্ষ্মতার মাপকাঠির। গত কয়েক-শো বছরের কথাই যদি ধরা যায় তাহলেও দেখতে পাই, অভিনয় কোন অবস্থা থেকে কোন পর্যায়ে উঠে এসেছে। কিংবা, তুলনামূলক আলোচনায়, এখনও গ্রামের গণ্ডি থেকে শহরের সভায় এসে নাটক কী রূপ নিয়েছে। মধ্যযুগে পৃথিবীজোড়া অভিনয়ের যে সাজপোশাক, মুখোশ, রং-চং ইত্যাদির ব্যবহার, কিংবা যাত্রার আসরের বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠক্ষেপ, তার সঙ্গে আজকের অভিনয়ের তফাত সহজেই নজরে পড়ে।

অভিনয় বাস্তবানুগ শিল্পকলা। কিন্তু সেই বাস্তবের রূপারোপ একদিকে যেমন অভিনেতাদের চালে-চলনে, চেহারায় বলনে, অঙ্গসজ্জায় আভরণে প্রকাশ পায়, যাকে সহায়তা করে মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতির বাস্তবানুগ ভঙ্গি, তেমনি আবার এর আরেকটা দিক আছে যেখানে মনকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে সাজসজ্জা পট দৃশ্যাবলীর বালাই ঘুচিয়ে দেওয়া হয়।

এই সূত্রে নাট্যমঞ্চ ও অভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল এরূপ আমি বোধ করি না।…কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তার পূর্ণ গৌরব।…নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আকা মাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়।"

অবনীন্দ্রনাথের উক্তি—"ধব কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হল। হরিণ শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে, দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। থিয়েটারওয়ালা এখানে এসে ঠেকবে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের, হরিণের, কিছুরই। স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাঠ কাগজে কাদায় গড়া রথ-ঘোড়া সবই, তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা স্টেজের উপরে, রাজার মৃগয়া যাত্রার একটা বৈরূপ্য-ঘটন ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। কাজেই থিয়েটারের স্টেজে এ-অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয়, সে গানের পর জুড়ির গানের বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ

তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছে। গীতছন্দে স্যন্দন চল্লো, হরিণ দৌড়লো নানা বর্ণের মধ্য দিয়ে দৃশ্য-পরম্পরা ছাড়িয়ে, চলে গেল তার মন সহজ উপায়ে যাত্রাতে।"

অভিনয়ের মধ্যে নাট্যকার থাকেন প্রচ্ছন্ন, আর অভিনেতাদের ব্যঞ্জনার মধ্যে দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গও অলক্ষ্যে ঢুকে যান। সেইজন্য নাটককে বলা যেতে পারে যৌথ ব্যাপার। ঘটনার আবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনের পরিচয় দেওয়া নাটকের কাজ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের অনুকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়।" নাটকে তাই বহিরঙ্গের কথা ভাবতে হয়। রাজাকে সাজাতে হয় রাজকীয় পোশাক দিয়ে, সেনাপতির হাতে দিতে হয় তলোয়ার। সেটা যদি সত্যিকারের রাজপরিচ্ছদ বা খাঁটি তরবারি নাও হয় তবু এমন একটা পথ নিতে হয় যাতে রাজা বা সেনাপতি বলে চেনা যায়। এমনি করে প্রতীকের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই প্রতীক বা মুদ্রার প্রয়োগ হয়েছে বহুলভাবে নাচের মধ্যে। কেননা নাচের বেলায় কথার সাহায্য পাওয়া যায় না; দেহের বাণীতেই প্রকাশ। সুতরাং অঙ্গভঙ্গি থেকে শুরু করে আকুতি-মিনতির ভাষা ফুটিয়ে তুলতে হয় দেহের ব্যঞ্জনায়। অভিনয়ের চরম এবং সূক্ষ্মতম বিকাশ তাই নৃত্যে।

নাটকের আরেকটি দিক আছে: সেটি এর ভিতরের দিক, অন্তর্মুখিতা। অর্থাৎ একদিকে যেমন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটক এগিয়ে চলে চরম পরিণতির পথে, অন্যদিকে তেমনি অন্তর্মুখী গতিতে মনের আবরণ খুলে খুলে রহস্যকে অনাবৃত করে চলতে থাকে নাটক। সুতরাং মনের অথবা মননের দিকটা নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমাদের দেশের নাটকে বা যাত্রায় এই বিশেষত্বগুলিকে কখনোই অবহেলা করা হয় নি। অর্থাৎ, দর্শক বা শ্রোতার প্রতি বরাবরই সশ্রদ্ধ আস্থা ছিল বলে
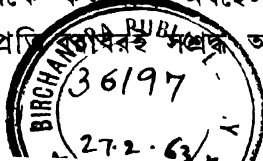
নাটকে বহিরঙ্গের বাহুল্য যেমন বর্জিত, নাটকের কাহিনী বা কথ্যাংশও তেমনি ইঙ্গিতবহুল। ইউরোপে এমনটি যে হয় নি তা নয়। কিন্তু নাটককে অতিমাত্রায় বাস্তব রূপ দিয়ে তার ইঙ্গিতের অংশ বা প্রতীকধর্মিতাকে খর্ব করা যে হয়েছে তার প্রমাণ মিলবে আমাদের সাম্প্রতিক থিয়েটারগুলির আড়ম্বরবহুল দৃশ্যপট মঞ্চসজ্জা আলোকপাত ইত্যাদিতে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে মনের চলাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন! তাঁর কাব্যের প্রধান যে সুর—সীমার মধ্যে অসীমের পালা—তার সাক্ষাৎ আমরা নাটকের মধ্যেও পাই। তাই এগুলি একটু কাব্য-ঘেঁষা। বলতে পারি, জীবনের মূল প্রেরণা—হৃদয়ঘেঁষা। সেইজন্যই বোধহয় তাঁর কোনো নাটক রঙ্গমঞ্চে রজতজয়ন্তী-সপ্তাহ অতিক্রম করে নি এবং তিনিও সেভাবে পেশাদারী মঞ্চে নাটককে টেনে নিয়ে যান নি। রবীন্দ্র-নাটক তাই বিশেষ একটা গণ্ডি বা মর্মগ্রাহী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। রঙ্গমঞ্চে ব্যবসায়িক সাফল্যলাভের জন্য নাটককে সাধারণের চলতি রুচি এবং নাট্যকারের মানসিক রুচির সঙ্গে আপস করে চলতে হয়। নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো উত্তেজনার সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো স্রষ্টার তাতে মন ভরে না। সে পথ তাঁর নয়। বাইরের থেকে ভিতরের দিকেই তাঁর রচনার গতি। তাই বোধহয় 'রাজা ও রাণী' নাটককে 'তপতী' নাটিকায় ঢেলে সাজিয়েছিলেন। আমাদের দেশের মূল ভাবধারাই অন্তর্মুখী। কালিদাসের নাটকে আমরা বাহ্য অস্থিরতা বা চঞ্চলতার প্রকাশ দেখি না। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকে শকুন্তলার প্রত্যাগমনকে কেন্দ্র করে খুবই একটা গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু সেই ঝড়কে অন্তরের আভাসে ধরে রেখে অপরূপ আনন্দ আর প্রশান্তির আচ্ছাদনে কালিদাস আড়াল করে রেখেছেন। তেমনি 'নটীর পূজা' নাটকে দুই ধর্মের সংঘাতে যে

বহ্নি জ্বলে উঠতে পারত, সেই বহ্নিকে নেপথ্যে রেখে নটীর মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে অপূর্ব প্রশান্তির আবরণে রবীন্দ্রনাথ তা রূপায়িত করেছেন। অথচ বহ্নির জ্বালা ও দীপ্তি রয়েছে সমগ্র নাটকটিতে ছড়ানো। বাইরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে আরেক জগতের সৃষ্টি করে। সেই নূতন জগতের রস সৃষ্টির পথ বিভিন্ন। কেউবা সংঘাতের পর্যায়ে পর্যায়ে তাকে উদ্ঘাটিত করেন, কেউবা ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে সেই রসকে মহনীয় এবং মোহনীয় করে তোলেন। রবীন্দ্র-নাটকে আমরা পাই জীবনের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে জীবনবোধের দ্বন্দ্ব, জীবনীরসের অভিব্যক্তি। মনকে আবরণমুক্ত এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবার জন্য বাইরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যতটুকু চমক লাগানো অপরিহার্য, রবীন্দ্রনাথ ততটুকুই করেছেন, তার বেশি নয়।

রবীন্দ্র-নাটককে সাধারণভাবে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, সামাজিক নাটক, ইতিহাস-ভিত্তিক নাটক, রূপক, প্রহসন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বা নাটকীয়ত্বের বিচার আমার প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। তবুও গানের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যরসবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে প্রথম যুগের দু-চারটি নাটক বাদ দিলে রবীন্দ্র-নাটকের একটা প্রধান অংশই গান। ক্রমে গানের সঙ্গে নাচও জায়গা নিয়েছে। ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শে রচিত বাংলা নাটকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে গানকে গাঁটছড়া বাঁধতে দেখা যায় না। আমাদের প্রাচীন যাত্রার পালাতে গানের অংশ প্রধান। এমন কি, কোনো কোনো ভূমিকায় অভিনেতার মুখে কথা নেই, শুধু গান। ইউরোপে গানের যোগ জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন নয় বলে সে দেশে শুধু সুরের পটভূমিকাতেই অভিনয়ের গতিবেগ সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশে গানের সুর শুধু অনুভূতির নীরব সাক্ষী নয়,

অভিনয়ের বিশিষ্ট অংশীদার। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক থেকে শুরু করে আমাদের সব নাট্যকারই গানকে কম-বেশি কাজে লাগিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এর আতিশয্যও দেখা গিয়েছে এবং পরিমিত বা সুমিত প্রয়োগের অভাবে রস গাঁজিয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই গানের প্রয়োগ-সাফল্য অনুধাবনযোগ্য। এমনকি সামাজিক বা ইতিহাস-ভিত্তিক নাটক —যেখানে গানের প্রয়োগ অবান্তর না হলেও গৌণ—সে ক্ষেত্রেও তিনি গানকে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। 'রাজা ও রাণী' নাটকে গীত-প্রয়োগ তাঁর অন্যান্য নাটকের তুলনায় অপরিহার্য না হলেও প্রক্ষিপ্ত অথবা জোর করে ঢোকানো মনে হয় না। বরঞ্চ ঐ ক'টি গান যেন স্বাভাবিকভাবেই এসেছে বলে মনে হয়। 'বিসর্জন' নাটকে অপণার ঐ একটি গানেই তার চরিত্রমাধুর্য, এবং নাটকটিতে তার অংশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তেমনি হয়েছে জয়সিংহের গানে। কথা দিয়ে কিংবা ঘটনা দিয়ে মনের এই রূপ সহজে প্রকাশ করা যেত না। অবশ্য এর পরে রবীন্দ্রনাথের যে সব ইতিহাসাশ্রিত নাটক পাই, যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'পরিত্রাণ'—সেগুলির মধ্যে গানের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। বসন্ত রায়ের কণ্ঠে গান দিয়ে তাঁর ছেলেমানুষি সহজ উদার মনটিকে যেমন সহজেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি ধনঞ্জয়ের গলায় গান ছাড়া এমন আর কোনো বাণী ছিল না যাতে তার বক্তব্যটুকু পুরোপুরি প্রকাশ পেত এবং চরিত্রটি ধরা পড়ত। নাটকটির যা কিছু নাটকীয়তা বা পরিণাম-মাধুর্য তা গানকেই কেন্দ্র করে।

এই বিশেষত্বটি অপরাপর রবীন্দ্র-নাটকে আরো বেশি করে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক, কিংবা রূপক-জাতীয় নাটক—সবগুলিতেই গানের বিশেষ স্থান বা উদ্দেশ্য আছে। নাটকের প্রধান বিশেষত্ব গতির দ্বিত্ব। একটি ধারা গভীরতামুখী, অপরটি পরিণামমুখী। একদিকে যেমন পাত্রপাত্রীর মনের দ্বন্দ্ব,

হৃদয়ের গভীরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি ঘটনা নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, এবং একই সঙ্গে পাত্রপাত্রীর চরিত্রের চরমতম প্রকাশ ও ঘটনার যবনিকাপাত হয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের এই চরম বিকাশ হয়েছে মনকে কেন্দ্র করে, এবং যবনিকাপাত এমন জায়গায় এসে হয়েছে যে ঘটনাকে তারপরে আরো কিছুটা টেনে নিয়ে যদি বা যাওয়া যেত তবুও আর বেশি কিছু বলবার বা প্রকাশ করবার থাকত না। অবশ্য 'শোধবোধ', 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা', প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসন জাতীয় সামাজিক নাটকে এই বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিমাণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। এগুলির মধ্যে গানের সুমিত প্রয়োগ অবশ্যই হয়ে থাকবে, তবুও গীতপ্রয়োগ সম্পর্কে তার বেশি আর কিছু বলবার থাকে না। অর্থাৎ, নাটকের মধ্যে গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও সর্বাংশে অবিচ্ছেদ্য নয়। 'বাঁশরী' নাটক সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে এক্ষেত্রে উপরোক্ত নাটকগুলির তুলনায় গান আরেকটু বেশি নাটকীয় সার্থকতা লাভ করেছে। 'ডাকঘর' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কয়েকটি গান জুড়ে দিয়ে নাট্যরসকে একাধারে দূরগ্রাহী এবং মর্মগ্রাহী করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একথা বললে অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্র-নাটকে গান যেমন বিচিত্র রস বা relief-এর সৃষ্টি করে তেমনি মূল নাট্যরসকে ঘনীভূতও করে।

কারণ, নাটকের প্রধান বাহন অভিনয়, এবং অভিনয়ের মাধ্যম যেমন বিশেষ ভঙ্গির আবৃত্তি ও সেই বাকভঙ্গির সঙ্গে গতিভঙ্গি বা action, তেমনি গীত-নৃত্যাদিও। রবীন্দ্রনাথ এই সব ক'টি মাধ্যমই তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। একথা আমরা জানি যে লিখিত বাণীকে বাস্তব রূপ দিতে কথার মধ্যে নানান ঝোঁক বা ভঙ্গি আনতে হয়। তাতেও যখন কুলোয় না তখন অন্তরের গভীরতর অনুভূতি প্রকাশ করা যায় গানে। কিন্তু এমন বিষয় আছে যার অনুভূতি গানেও প্রকাশ করা যায় না। তখন কাজে লাগে

অঙ্গভঙ্গি, মুখের ভাব, চোখের ভাষা। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র দেহমন জুড়ে গীতস্পন্দন জেগে ওঠে। এই স্পন্দনেরই ইঙ্গিতময় রূপারোপ নৃত্যে। তাই রবীন্দ্র-নাটকে আমরা কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্যের সঙ্গে দেখি চিত্রযোজনা। রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক কাব্যপ্রধান, কোনটা বা নৃত্যপ্রধান বা গীতপ্রধান। এর বাইরেও যে কয়েকটি নাটক আছে সেগুলির কথা আগে আমি বলেছি। আমার বক্তব্য প্রসঙ্গে অবান্তর বিবেচনায় 'মালিনী' প্রভৃতি কাব্য-নাটক সম্পর্কে এখানে কিছু বলব না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি নিয়ে বিচার করলে তার মধ্যে কাব্যগুণেরও দর্শন মেলে। এমনকি 'ডাকঘর' বা 'গৃহপ্রবেশ' জাতীয় গদ্যছন্দের নাটকের মধ্যেও কাব্যকৃতি উঁকি মারে। 'নটীর পূজা' নাটকে বিরোধ ঘনিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে, এবং মুক্তির আভাস গানের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে শেষ নৃত্য-সম্বলিত গানে হয়েছে চরম পরিণতি। নাটকের মধ্যে নাচের এই ধরণের ব্যবহার শুধু রবীন্দ্র-নাটকেই নয় বাংলা নাটকের ইতিহাসেও প্রথম। কিন্তু নাট্যরচনার বিশিষ্ট নিদর্শন ঋতুনাট্য এবং রূপকনাট্যগুলি। ঋতুনাট্যেও আবার দেখতে পাই দুই রূপের প্রকাশ। একটি ঋতুর বাইরের রূপ, অপরটি অন্তরের। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতিক চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্য মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে।...প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র! বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আরেক মূর্তি।...একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি - একই সময়ে এক দিকে তার কর্ম, আরেক দিকে তার ছুটি বাহিরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।"

তাই 'শারোদৎসব' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন ঋণশোধের আয়োজন। সেখানে উপনন্দ পংক্তির পর পংক্তি লেখে আর মুক্তির পর মুক্তি পায়। কর্তব্যের মধ্য দিয়ে চলে আনন্দের ঋণশোধের পালা। তেমনি 'ফাল্গুনী' নাটকেও দেখি শীতের কঠোরতার মধ্য দিয়ে এসে তবেই বসন্তের আবির্ভাব। বাউল বলে, "যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।...যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—আমরা পথের বিচার করিনি—আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি—আমরা ছুটে এসেছি আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কী হত?"

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য 'শ্রাবণ গাথা', 'শেষবর্ষণ', 'নবীন', 'বসন্ত', প্রভৃতি কতরগুলির মধ্যে দেখতে পাই গানই প্রধান অংশ নিয়েছে,—গানের মালায় কথাভিনয়ের সুতো জুড়ে দিয়ে নাটকীয় সঙ্গতি বজায় রাখা হয়েছে শুধু। আবার আরেক ধরণের নাটক হল 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি—যেখানে গানের ব্যবহার মূল নাট্যাংশের পরিপূরক হিসেবে। এক্ষেত্রে গান না থাকলে নাটক একপেশে—হয়তো কিছুটা ধোঁয়াটে হয়ে যেত। এই সূত্রে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়,—অধিকাংশ গানেরই বাউল সুর, এবং যথার্থ বাউলের মুখেই গেয়। তার কারণ বোধ হয় এই হতে পারে যে বাউল গানের কথায়, সুরে একাধারে তত্ত্ব ও সহজত্ব ধ্বনিত হয়,—একদিকে রিক্ততা অন্যদিকে পূর্ণতার বাণী নিয়ে আসে,—একদিকে পথ অন্যদিকে পথ হারানো,—একাধারে সীমা ও অসীমের প্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে ও তাকে ছাড়িয়ে উপলব্ধির আরেক আশ্চর্য জগতে আমাদের নিয়ে যায় এই গান। কিন্তু এছাড়াও বিচিত্রধর্মী আরো যে সব রবীন্দ্র-নাটক আছে, যেমন 'অরূপরতন', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', ইত্যাদি,

—সেখানেও গানের ঠিক এই ধরণের আসনই দেখতে পাই। এই রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটকগুলি নানারকম অর্থ নিয়ে আমাদের মনের খাতায় দাগ টেনে যায়। কোনোটা বা রূপের সঙ্গে রূপাতীতের কথা বলে, কোনোটা বা আমাদের সংস্কারগত বাড়াবাড়ি, কিংবা যন্ত্রসভ্যতার অকিঞ্চিৎকরতা, অথবা অকারণ শ্রেণীসংঘাতের দ্বন্দ্বের কথা বলে,—আবার হয়তো এসবের অতীত এক ভিন্ন অর্থ নিয়ে একেবারে ভিন্ন রসের সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎকে নাড়া দিয়ে যায় একই সুরে, একই রসে।

এই পর্যায়ে এসে যেন একটা মোড় নিয়েছে রবীন্দ্র-নাটক। খুঁজে পেয়েছে আরেক নূতন রাস্তা। মনে হয়েছে আরো আছে, অভিনয়কে আরো সুন্দর করে সার্থকতর করে তুলতে হবে। তাই কথার মেলা আর সুরের খেলার সঙ্গে এল দেহের দোলা। অর্থ-বাহী বাণীর সঙ্গে গভীর সুরের সংযোগে যতটুকু প্রকাশ করা যাচ্ছিল তার চেয়ে আরো বেশি প্রকাশের চেষ্টায় শুধু কথা আর সুর যেন পেরে ওঠে না, তখন ইঙ্গিতময় দেহের বিন্যাসে নৃত্যছন্দের আভাসে বলতে হয় বাকিটুক্। অভিনয়ের মধ্যে অবশ্য এ জিনিসটা এমনিতেই থাকে প্রচ্ছন্নভাবে। রবীন্দ্রনাথ এককালে তাঁর নাটকে বাউল প্রভৃতি গানের মধ্যে একটু করে নাচের ভঙ্গি যে চালু করেন নি তা নয়। কিন্তু পরিশেষে আমরা পেয়েছি নৃত্যনাট্য, যা একেবারে স্বতন্ত্র জিনিস। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের মাঝখানে আরেকটি রচনা আছে একক গৌরবে, সেটি 'তাসের দেশ'। আমাদের অন্ধসংস্কার, অলসতা, কর্মবিমুখতা, গতানুগতিকতায় গা-ঢালা ভাব,—এই সবের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কশাঘাত যেমন এই নাটকটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে, তেমনি গীতব্যঞ্জনা ও নৃত্যছন্দে নাটকটি এক আশ্চর্য গতি লাভ করেছে। কথা, গান এবং নাচের ভঙ্গিমাগুলি যেমন এক অবিচ্ছেদ্য ছন্দে তালে রয়েছে বিধৃত, তেমনি অসীম মুক্তি এনে দিয়েছে ভাবের রাজ্যে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে যেমন গানের প্রাধান্য, নৃত্যনাট্যে তেমনি নাচের প্রাধান্য। এ দুটিকে ইংরেজি অপেরা এবং ব্যালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যে নাটকে গানই প্রধান,—যেখানে গানই অভিনয়ের একমাত্র বাহন, তাকেই বলে অপেরা। গান এবং অভিনয়ের সমন্বয়েই তার সার্থকতা। সাধারণ নাটকের মধ্যে গান থাকে শুধু বৈচিত্র্যের জন্য,—না থাকলেও রসহানি হয় না। কিন্তু গানই অপেরার প্রাণ,—কথাবার্তার ভাষা সেখানে অচল। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ছাড়া অন্যান্য নাটকেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মতো এই যে কেবলমাত্র গানই যদিও এদের বাহন নয়, তবুও গান বাদ দিয়ে সে নাটক পরিপূর্ণ হয় না। গান একমাত্র না হয়েও অপরিহার্য। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে। ...বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"

কিন্তু 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ইহার অনেক কাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আরেকটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে; গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।" সুতরাং এই বিচারে রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলিতে গানের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য দেখা যায় সেগুলিকেও এক ধরণের গীতি-

নাট্য যদি বলি তবে গীতিনাট্য কথাটির বিশেষ অর্থটুকু বজায় থাকে না। যেমন অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা, প্রভৃতিকেও যদি ঋতুনাট্য বলে প্রমাণ করতে চাই তবে ঋতুনাট্য কথাটির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য থাকে না। অথচ তত্ত্ববিচারের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে এই নাটকগুলিকে অনুরূপ পর্যায় ভুক্ত করা যায় না তা নয়। এবং গীতিনাট্য, তত্ত্বনাট্য, ঋতুনাট্য, রূপকনাট্য,—সব মিলে-মিশে মিশ্রিত এক রসরূপ ফুটে ওঠে।

নৃত্যনাট্যকে ইংরেজি ব্যালের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সঙ্গীত এবং নৃত্যের মিলনে ব্যালের সৃষ্টি। প্রাচীন ইংলণ্ডে মাস্ক (masque) নামে গান, কথা ও মূকাভিনয় সংযুক্ত একধরণের অভিনয় প্রচলিত ছিল। তারই পরিণত রূপ ব্যালে। কিন্তু ইউরোপীয় ব্যালে নৃত্যে কথা বা গানের অংশ নেই, অর্কেষ্ট্রাই প্রধান, অর্থাৎ সুর ও নৃত্যের মিলন। অর্কেষ্ট্রার সুরে যা বোঝাতে চাওয়া, নৃত্যছন্দে তাই ব্যক্ত করা। এবং নৃত্যের বক্তব্যকেও সুরে আরোপ করা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও এই এক ধরণেরই প্রকাশ; তবে এখানে যন্ত্রসঙ্গীত মুখ্য নয়, তার আসন নিয়েছে সুরসম্বলিত কথা। 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'শাপমোচন' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য কথার সঙ্গে সুরের এবং সুরের সঙ্গে নৃত্যছন্দের সংযোগে অভিনীত এক সমগ্র রূপ। সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্যাদি সহযোগে এগুলি পরিপূর্ণ নাট্যাভিনয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। অভিনয় যেখানে মুখ্য সেখানে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যা রাখা হবে তা যেন চরিত্র প্রকাশে এবং নাটকীয় গতিবৈচিত্র্যে চরম সার্থকতা লাভ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু কথা দিয়ে যেখানে অভিনয়ের পূর্ণ প্রকাশের তৃপ্তি পান নি, সেখানে গান ব্যবহার করেছেন। অবার যখন বাণী আরো গভীর বলে মনে হয়েছে তখন তার প্রকাশে মূকাভিনয় এবং নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যম অবলম্বন করেছেন। রবীন্দ্র-নাটক আন্তর-রসে এত গভীর যে তার

প্রকাশ খোলাখুলি কথা দিয়ে সব সময়ে সম্ভব হয় না,—আরো কিছু বাকি থেকে যায়। 'সেই পাদপূরণের জন্য নূতন নূতন রসের উদ্ভাবন।

রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা, দৃশ্য সংস্থাপন, অভিনেতৃবর্গের পোশাক এবং অভিনয় ধারায় কিছু অভিনবত্ব বা বিশেষত্ব আছে তা সকলেই জানেন। এগুলি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এক কথায় বলতে হয় বাহুল্যবর্জিত অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করাই লক্ষ্য। অভিনবত্ব অর্থে কোনো জাঁকজমক বা হঠাৎ চমক নয়। চরিত্র-চিত্রণে বাইরের চাকচিক্য বর্জন করে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তার সহজ রূপ বা স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা। পোশাকটাও হবে সেই চরিত্রের অনুযায়ী সহজ, স্বাভাবিক। আর মঞ্চসজ্জা হবে এমন যাতে নাটককে ছাড়িয়ে সেটাই প্রধান হয়ে না ওঠে। যাত্রার আসর আর থিয়েটারি ঢং সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।" অন্তরের গভীরতামুখী গতিটাই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। অভিনয়ে কুশীলবের দায়িত্ব শুধু নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলিকে প্রকাশ করা; অভিনয়কালে কথার মধ্যে যদি অতিরিক্ত ভাবাবেশ অথবা স্বাভাবিকতাতিরিক্ত জোর দেওয়া যায় তবে অভিনয়-নৈপুণ্যের তারিফ হলেও অভিনীতব্য জিনিসটির বিশেষত্ব বজায় থাকে না। মঞ্চসজ্জা এবং কুশীলবের সাজসজ্জার ব্যাপারেও ঐ একই কথা। জাঁকজমকের ফলে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে রবীন্দ্র-নাটক অভিনয় করতে গিয়ে নির্দিষ্ট নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রতীক বা সাঙ্কেতিক অর্থ বার করে নিয়ে কুশীলবের পরিচ্ছদে, মঞ্চসজ্জায় এবং অভিনয়ের ধরনে বিশেষ কোনো ভাব এবং বাস্তব ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধরনের অভিনয় নিখুঁত হলেও

রবীন্দ্র-নাটকের মূল সুরের পরিপন্থী। এতে রবীন্দ্র-নাটককে একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে তার রসকে সীমিত এবং একপেশে করা হয়। সহজ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সরল রসের প্রকাশ এবং নাট্য-রসের ব্যাপ্তিই রবীন্দ্র-নাটকের বিশেষত্ব। নাটকের মধ্য থেকে জোর করে কোনো একটা বিশেষ বক্তব্য বার করবার চেষ্টার মধ্যে বাহাদুরি আছে, বাহবাও মিলবার কথা; কিন্তু সেই কষ্ট-চেষ্টা না করে নাটকটি যেমন আছে তেমন ভাবেই, অর্থাৎ সহজ ভাবে অভিনয় করে গেলেই ভাল, তার বক্তব্য যদি কিছু থাকে তো সেটা নাট্যকারের কৃতিত্ব এবং সমঝদারদের বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। তা না হলে রবীন্দ্র-নাটকের কথা, গান, নৃত্য প্রভৃতির বিশেষ মাধুর্য বা বৈশিষ্ট্য থাকে না, এবং পরোক্ষে নাটক, তথা নাট্যকারকে খাটো করা হয়।

সাম্প্রতিক সহজ সরল অভিনয়-প্রথার মূলে রবীন্দ্রনাথের দান আছে। আমরা এই ধরনের অভিনয়ই আজকাল পছন্দ করি, এবং এর ব্যতিক্রম হলেই বলি 'যাত্রা' হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যাত্রার দলের পোশাক এবং ব্যঞ্জনাবাহুল্য আমাদের ভাল লাগে না। অথচ যাত্রায় মঞ্চসজ্জা এবং দৃশ্য সংস্থাপনের বন্দোবস্ত থাকে না বলে মনটা আরেক দিকে ছাড়া পায়। রবীন্দ্রনাথ এই দুই দিকে দৃষ্টি রেখে এবং এই দুই বিরুদ্ধ-ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে দিয়ে অভিনেতা এবং শ্রোতাকে কাছাকাছি এনে দিয়েছেন। তাই সাধারণের মনের মানের উপরে রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়-সমীক্ষা নির্ভর করে। কবিতা, গল্প থেকে শুরু করে নাটক—গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রসের বিভিন্ন সমাবেশে সমঝদারির অপেক্ষা রাখে। সাহিত্য-রচয়িতা ও পাঠকের মধ্যে নিবদ্ধ। গানের বেলায় এই দুজনের মাঝখানে আছেন গায়ক। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতা। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে আবার অভিনেতা, গাইয়ে, নাচিয়ে সকলের সমাবেশ। সুতরাং এগুলি মঞ্চস্থ করার সময়ে যাতে

চিত্রাঙ্গদার রূপসজ্জায় কুশলী নৃত্যশিল্পী

সেবা মিত্র

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

[শ্রীসলিল ঘোষের সৌজন্যে]

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে আহিরিণীদের নৃত্যদৃশ্য

'বসন্ত উৎসবে' নাচের দল

[ফোটো : শ্রীবিশ্বনাথ পাল]
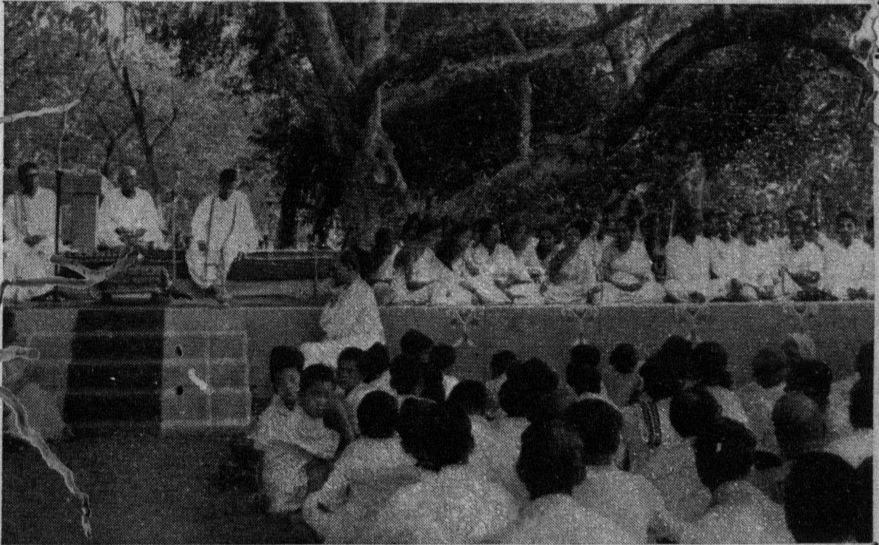
রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনী

[ফোটো : শ্রীবিশ্বনাথ পাল]

'তাসের দেশ' অভিনয়ের একটি দৃশ্য

[শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

রবীন্দ্রনাথের সম্মেলক সঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীতের চরিত্র একক রাগিণী বিস্তারের। রাগের মিশ্রণ চলে, কিন্তু কণ্ঠের মিশ্রণ চলে না। নানাবিধ যন্ত্র বা একাধিক কণ্ঠের প্রয়োগ কখনো কখনো যেটুকু দেখতে পাই তাও এই সঙ্গীতের মূল প্রকৃতিকে বিশেষ নাড়া দিতে পারে না। কখনো কখনো ওস্তাদদের যে দ্বৈতভাবে একই রাগিণী গাইতে বা বাজাতে দেখা যায় তা মূলতঃ পরস্পরকে সুরের খেলায় সহায়তা করবার জন্য। এই কারণে ভারতীয় সঙ্গীত বিস্তারে অভিনবত্ব দেখালেও সুর এবং স্বর-মিশ্রণে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে নি, নূতন নূতন সৃষ্টিতে নানামুখী হয় নি।

কিন্তু ইউরোপীয় সঙ্গীত বহুলাংশে মিশ্রণে বিচিত্র। কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একযোগে বিবিধ কণ্ঠের গান সীমাবদ্ধ হলেও যন্ত্রসঙ্গীতের বেলায় অর্কেষ্ট্রার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যময়। ভারতীয় সঙ্গীতের সাতটা সুর মিলে-মিশে একই খাতে বয়ে চলে একটি সুর-রূপ প্রকাশ করতে। ইউরোপীয় সঙ্গীতে সাতটা সুর বিভিন্ন সুর-রূপে প্রকাশিত হয়ে এক সামঞ্জস্য নিয়ে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে যন্ত্রমণ্ডলে।

পূর্ব ও পশ্চিমের দুই সাঙ্গীতিক ধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "হার্মনি বা স্বরসঙ্গতি ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বস্তু, আর রাগ-রাগিণীই আমাদের সঙ্গীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে।...য়ুরোপের সঙ্গীতে দেখিতে পাই, মানুষের সমস্ত ঢেউ-খেলার সঙ্গে তাহার তাল-মানের যোগ আছে, মানুষের হাসি-কান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সঙ্গীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বাহিয়া আসে। য়ুরোপের সঙ্গীতে মানুষ

আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানারঙের ঝাড়-লণ্ঠনে বিচিত্র করিয়া জ্বালাইয়াছে; আমাদের সঙ্গীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে।...আমাদের সঙ্গীত আমাদের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।" ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের এই মূলগত প্রভেদ থেকেই এদের রূপগত প্রভেদেরও কারণ খুঁজে পাই।

আমাদের গানে হার্মনির চলন নেই, যন্ত্রমণ্ডল বা অর্কেষ্ট্রার প্রচলনও নেই। সাম্প্রতিক কালে এদিকে কিছু যে চেষ্টা চলছে সেটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত বা বাদ্যবৃন্দের ব্যাপার অর্কেষ্ট্রা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। বরঞ্চ কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সম্মেলক গান বা কোরাস গীত-পদ্ধতি বহুলাংশে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে। ইউরোপীয় স্বরস্থানের সঙ্গে আমাদের মূলগত পার্থক্য থাকার জন্য হার্মনির সুষ্ঠু প্রয়োগ আমাদের গানে হয়ে ওঠে না। কিন্তু কোরাস গান সম্ভব হয়েছে। 'কোরাস' কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। আদিরূপে কোরাস ছিল ধর্মীয় নৃত্যগীত। নাচ, গান এবং অভিনয় তিনটিই চলত মিলেমিশে। এমন কি এক সঙ্গে তিনশো জনও গান করত। গীর্জাতে ভজন গানের মধ্যেই আদিযুগে কোরাস সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে মধ্যযুগে হেণ্ডেল, পার্সেল প্রমুখ গীতস্রষ্টাদের হাতে পড়ে দ্বৈত, ত্রয়ী কিংবা চার জনের মিলিত কণ্ঠে ভাগাভাগি করে কোরাস বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের যৌথ-গানে প্রতিটি কণ্ঠ আলাদা ভাবে গান করে একটা সমগ্র সঙ্গীতকে রূপায়িত করত, এবং এ গান তখনই পরিপূর্ণ রূপ পেত যখন সকলের মিলিত কণ্ঠ মাত্র একটি ভাব বা বিষয়কে ফুটিয়ে তুলত। অনেক সময়ে সুরের মধ্য দিয়েই উত্তর প্রত্যুত্তর চলত এবং সুরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে মূল ভাবটিকে প্রাঞ্জল করে তোলা হত। এটা ছিল কোরাস জাতীয় গানের লৌকিক রূপ। কোরাস গানের ধারা গ্রীস থেকে রোম হয়ে ইউরোপে এসে

পৌঁছয়, এবং লৌকিক রূপে সাধারণ অপেরার যৌথসঙ্গীতে আত্ম-প্রকাশ করে। বহু জনের মিশ্রিত কণ্ঠে পুরো গান অথবা গানের অংশ বিশেষ গীত হলে তাকেই বলে কোরাস। স্বভাবতই এর প্রয়োজন বাহ্যিক। অর্থাৎ অপেরাতে যাতে সকলে গান শুনতে পায়, অথবা নাটকের মধ্যে গানের পরিবেশটিকে ফুটিয়ে তোলা যায়, এই প্রয়োজনেই এর চলন হয়েছে বলে মনে হয়।

যৌথ সঙ্গীতের আলোচনায় ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ আধুনিক সমবেত গান প্রায় সর্বাংশেই বিদেশীয় কোরাসের অনুসরণে রচিত। আজকাল ঘরের আঙিনা সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত। বিদেশী সঙ্গীতের, বিশেষ করে ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই আর পাঁচটা জিনিসের মতো আমাদের সঙ্গীতের উপরে পড়েছে। বলতে গেলে, এখন বাংলা গানে কোরাসের যে সব ভঙ্গি আর চাল লক্ষ্য করা যায় তার প্রায় সবটাই বিদেশী ছাঁচের। কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশে যৌথ গানের প্রাচীন কোনো পদ্ধাত ছিল না মনে করবার কোনো হেতু নেই। আমাদের সমবেত সঙ্গীত শুধু রূপভেদে আজ 'কোরাস' হয়ে উঠেছে। প্রাচানকাল থেকেই আমাদের সঙ্গীতে যৌথ গায়নের চাল ছিল। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সঙ্গীত বলতে নৃত্য-গীত বাদ্যাদি সব বোঝায়। আদিম যুগের ধারা এই ভাবে চলে এসেছে বলে মনে করা যেতে পারে যে মানুষ যখন কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর ছিল, কিংবা যখন শিকার করে কিংবা বন-জঙ্গল থেকে আহরণ করে খাবার জোটাত, তখন তারা প্রধানত দেবতাকে তুষ্ট করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ঠেকাবার জন্য নানাবিধ কৃত্য করত। এই সব কৃত্যের মধ্যে দেবতাকে পূজা নিবেদন এবং নিজেদের আনন্দ প্রকাশ উভয় প্রকরণই ছিল। সুতরাং নাচ গান অভিনয় মিলে ছিল উৎসব। এগুলির একটির থেকে আরেকটিকে আলাদা করা তখন সম্ভবই ছিল না। আজকের দিনে পর্যন্ত আমরা তার রেশ দেখতে

পাই গাইয়েদের বোল-চাল অঙ্গ-ভঙ্গিতে, নাচিয়েদের গীত
তারপরে ক্রমে এগুলি স্বতন্ত্র রূপ পেয়ে হয়েছে নাচ, গান, ক
নাটক। কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যেই অন্য ধারার রেশ থেকে গি
তাই নাচের সঙ্গে গান বা অভিনয়, কবিতার মধ্যে সুর বা ন
রস সব বিজড়িত থাকে।

বৈদিক যুগের মন্ত্রগান ছিল সমবেত। সংস্কৃত মন্ত্রাদি
গানের মর্যাদা না পেলেও সুর করে আবৃত্তি করা হত। ভা
সঙ্গীত নিবেদনের ভঙ্গিতে ক্রমে ধ্রুপদ চালে আত্মপ্রকাশ ক
সৃষ্টি হল নানান রাগ-রাগিণীর। এইভাবে একক সঙ্গীত
লাভ করল এবং প্রতিষ্ঠিত হল বিশিষ্ট মর্যাদায়। কিন্তু স
সঙ্গীতের ধারা লুপ্ত হল না। বেঁচে রইল আমাদের লোক-সঙ্গ
জগতে। সে যুগের যাত্রা আর পাঁচালি গান, কবিগান, তরজা—
সবেতেই সমবেত কণ্ঠের প্রধান ভূমিকা। সমবেত কণ্ঠের চলন
আমাদের ধান-কাটার গান, নৌকা-বাইচের গান, সারিগান,
জারিগান, বাউল, ঝুমুর,—এমন কি কীর্তনের মধ্যেও। কীর্তনের
মধ্যে এর চাল কিছু আলাদা; অনেক ক্ষেত্রে বাউলেও। একটা বিশেষ
অংশ মূল কীর্তনিয়া বা মূল বাউল, গেয়ে যাবার পর ঘুরে ফিরে
গেয়ে যায় সাগরেদরা। এই গায়ন-পদ্ধতির মাধুর্য এই যে গানের
পর্ববিভাগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের চালটিকে শ্রুতিমধুর করে
তোলা হয়, পর্ববিভাগ সুনির্দিষ্ট হয় এবং গানের পালা চরম
পরিণতির ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে তোলে। অধিকাংশ লোক-সঙ্গীতই
গাওয়া হয় নৃত্য বা তালের সঙ্গে। সেইজন্য এর মধ্যে সুরের আর
ছন্দের সরলতা থাকে। কোরাস গানের বিশেষত্বও এই। কোনো
রাগসঙ্গীত সমবেত ভাবে গাওয়া চলে না। কারণ সে গান ব্যক্তি-
কেন্দ্রিক। রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে গানের যে অভিব্যক্তি তা রাগ-
রাগিণীর মাধুর্য এবং বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। কিন্তু সমবেত
গানের মধ্যে রাগ-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার ফাঁক নেই। এ গান

বিষয় বা বাক-নির্ভর। তাই এর জগৎ সীমিত, সংকীর্ণ। সেই কারণেই ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর পরিচর্যা হয় নি। সমবেত মন্ত্র-আবৃত্তি, ভজন-গান ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যৌথভাবে গান গাওয়ার রেওয়াজ যে রয়েছে তার কারণ লোক-সঙ্গীত বিশেষ কোন ব্যক্তি-নির্ভর নয়। তা লোকরঞ্জক। সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাব চলা। লোক মনের এবং লোকরীতির পরিবর্তন বা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সঙ্গীতেরও চালের ইতর-বিশেষ হয়। এক অঞ্চলের লোকগীতি অন্য অঞ্চলে বিশেষ সাড়া জাগায় না, কিংবা খুব একটা জনপ্রিয় হয় না। লোক-সংঙ্গীতের সুরের মধ্যে অদল-বদল বড় একটা দেখা যায় না; প্রায় একই ধবনের সুরে সব গান গাওয়া হয়। এক-একটা রাগিণীর বা সুরের [illegible] বদলে বিভিন্ন শ্রেণীতে এর বিভাগ ও পরিচয়। সেইজন্য বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, কীর্তন প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ ঢং; সুরের বদলে সম্প্রদায়ের নামেই এগুলির পরিচয়। অনিবার্য ভাবেই এইসব গান কথা-নির্ভর। ভাব বা বিষয় অনুযায়ী কথা সাজানোতেই মাধুর্য এবং সার্থকতা। সুতরাং এ গান যৌথভাবে গীত হলে সুরের বা রসের কোনো ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ সকলের অনুভূতিতে একই ধরনের আনন্দ তরঙ্গ তুলে জনচিত্ত [illegible] করে।

আধুনিক যুগে বাংলা কোরাস গানের মধ্যে যে সুরমিশ্রণ এবং ঢং প্রবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের অনুসরণ বললে ভুল বলা হবে না। কিন্তু মিশ্রণে, রীতিতে এবং চালে নূতনত্ব এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেশী-বিদেশী মিশ্রণে তিনি শুধু অগ্রণী নন, নিপুণ। বাংলা যৌথ-সঙ্গীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আধুনিক কালে এসে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই প্রথম বহুল পরিমাণে এবং নানান ভঙ্গিতে ইউরোপীয় ঢঙের কোরাস ব্যবহার করেছেন বাংলা গানে, বিশেষ করে তাঁর রচিত নাটকের প্রয়োজনে। সম্মেলক সঙ্গীত সার্থক গীত-রূপায়ণে ব্যাপ্তিলাভ করে স্বদেশী আমলে—

যখন স্বদেশী গানের বান এসেছিল বাংলা দেশে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির গানে গানে বন্ধন টুটে গিয়েছিল ;—গানের বন্ধন, মনের বন্ধন। দেশমাতৃকার বন্দনা, সমর সঙ্গীত, জাগরণ এবং উদ্দীপনার গান তখন সমবেত কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ঠেছে, সহস্র মন একসুরে একতালে বাঁধা পড়েছে। সেই জোয়ার কেটে যাবার পরেও আমাদের গানের ম ধ্য সম্মেলক সঙ্গীতের ধাবাটি বজায় থেকেছে। আজকের দিনে তা বিভিন্নমুখী, বিচিত্রধর্মী।

ববীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে বিশেষ কোনও রাগিণীকে কেন্দ্র করেই গীতবচনা করেছেন। স্বদেশী আমলের কথা ছেড়ে দিলে লক্ষ্য করা যায় যে পববর্তী যুগে,—বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে, নানাবিধ উৎসব, অনুষ্ঠান এবং নাটকের প্রয়োজনেই তিনি সম্মেলক গান চালু কবেন। এবং এর বিশেষত্বের দিকে নজব রেখে উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হন। তাঁব কোবাস-রীতি বৈচিত্র্যময়। কোনো গান আগাগোড়া একই ভাবে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। আবার অনেক গান আছে যাব এক-এক অংশ এক-এক রকম ভাবে সকলে মিলে গাওয়া হয়। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হবষে' গানটি যেমন দ্রুত ও বিলম্বিত লয়ে সকলে মিলেমিশে মিশ্রিত ঢঙে গাওয়া হয়ে থাকে। আবার 'নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ' গানটির মতো তালফেবতা গানও বিচিত্রভাবে মিলেমিশে গাইতে হয়,—কোনো কোনো অংশ আবার একক কণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে যেগুলিতে তিনি দু রকমের সুব বসিয়েছেন, যেমন 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তাঁরে দিবিরে ঠাঁই', 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে', 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা' ইত্যাদি। এগুলির প্রথম সুর থেকে দ্বিতীয় সুরের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছিল একক কণ্ঠের বদলে সমবেত ভাবে গাইবার প্রয়োজনে। ইংরেজি গীতপদ্ধতি থেকে হার্মনি বা স্বরসঙ্গতি নিয়েও তিনি

পরীক্ষা করেছেন। হার্মনি হল এক বা একাধিক স্বরের বৈজ্ঞানিক মিশ্রণ—বৈজ্ঞানিক অর্থে সঙ্গীত-বিজ্ঞানসম্মত। রাসায়নিক ধাতুগত মিশ্রণে যেমন দুই বা ততোধিক বস্তু গোপনে গোপনে স্বতন্ত্র থেকেও মিশ্রণজাত একটি দ্রব্যকে রূপ দেয়, হার্মনিও তেমনি স্বরগ্রাম, লয় এবং সুরের মিশ্রণজাত গীতরূপ। স্বরসন্নিবেশের এই রীতি বিলিতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকে কাজে লাগিয়ে কয়েকটি অপূর্ব কোরাসের সৃষ্টি করলেন; যেমন 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী', 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর', 'এ শুধু অলস মায়া', 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' ইত্যাদি। এবং এরই ছায়ায়, আর প্রাচীন গানের ধারায় মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে সব কোরাস গান বেদমন্ত্রের মতো সকলে মিলে এক সঙ্গে এক সুরে-তালে গাওয়া হয়, ব্রহ্ম-সঙ্গীতেরও অনেক গান যেগুলি শুদ্ধ সুরে এবং ধ্রুপদ-ধামারের বোলে-চালে গাওয়া হয় সমবেত ভাবে, সে সবেরই বা তুলনা কোথায়? লোক-সঙ্গীত ছাড়াও এই ধরনের গানে রবীন্দ্রনাথের কোরাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। স্বর, তান, লয়, মাত্রা প্রভৃতির সূক্ষ্মতম ব্যবহারের দিকে নজর রেখে গানগুলিতে কোরাসের ঢং আনা হয়েছে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যগানের মিলন ঘটেছে। এক সঙ্গে একশো-জন মিলে সমবেত ভাবে গানের ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, এবং শান্তিনিকেতনের অবদান নিঃসন্দেহ।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের প্রভেদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য "বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাৎ সেই অতি সূক্ষ্ম সুরগুলি নিয়ে যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। এরই যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে।

এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগ-রাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়।…য়ুরোপের প্রত্যেক গানে আছে বিশেষ ব্যক্তিত্ব, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনক রূপে প্রমাণ করবার জন্য।" সুতরাং একথা অতি স্পষ্ট যে, যে-গানের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ঠাসবুনুনি নেই, আছে ব্যক্তির অতীত এক রসজগৎ সৃষ্টির প্রয়াস, সে-গান আমেজ করে গাইবার জিনিস। সেখানে ব্যক্তির বিশেষত্ব থেকে রাগ-রাগিণীর বিশেষত্বই প্রধান। সেই জন্যই আমাদের মার্গসঙ্গীতে কোরাসের ঠাঁই নেই,—গীতরূপ বা গানের কাঠামোর চেয়ে রাগরূপ প্রধান। সেই গানই সম্মেলক ভাবে গাওয়া যায় যে-গানে নানান রাগরূপ ছুঁয়ে যায়, অথবা কোনো বিশেষ রাগের বিস্তার নেই,—তার বদলে আছে কথার দেয়ালে ঘেরা সুরের সুরপুরী। গানের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গীতকারের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে, কখনো বা বেশি প্রকট করে বাংলা গানের সৃষ্টি। ইউরোপীয় সঙ্গীতের বেলায় "ওস্তাদকে অনেক বেশি বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে হয়। গানের কর্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করে দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন।" এই সীমানা পাকা করে না দিলে সমবেত কণ্ঠেরও গান জমবে না, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতও না। আমাদের সঙ্গীতে কীর্তন, ঝুমুর, বা বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকসঙ্গীতের বেলাতেও সম্মেলক গীতাংশের সীমা নির্দিষ্ট। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অন্যান্য বাংলা গান, যেখানে গীতরচয়িতার ব্যক্তিত্ব কথায় এবং সুরে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে সেখানেই সম্মেলক গায়ন খাপ খেয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি বৈচিত্র্য যদি আনতে

হয় তবে অন্য কোনো পদ্ধতির সন্ধান করা দরকার। অর্কেষ্ট্রাতে সে রকম গীত রচনা সম্ভব। আর সম্ভব হতে পারে হার্মনির নূতনতর প্রয়োগে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করতে হলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলে চলতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে স্পর্ধা হবে। ...আমাদের গানের বিপুল তান-কর্তব ঐ হার্মনি বিভাগে চালান করে দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য রক্ষা পায় অথচ তার গতিপথ খোলা থাকে।" এই ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, এবং আর যে সব বাংলা গানে অন্যরকমের ওস্তাদী করবার অবকাশ গাইয়ের নেই সে সব ক্ষেত্রে সম্মেলক পদ্ধতিতে নানারকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইবার উপায় করে নিতে পারা যায়, এবং গানকে নানান বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে রস পরিবেষণ বিচিত্রতর করা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত বহু গানে বি| ঢালাই করে কোরাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'যখন সঘ . গরজে বরিষে করকাধারা', 'যে দিন সুনীল জলধি হইতে জননী ভারতবর্ষ', 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার দেশ' প্রভৃতি গানের সম্মেলক চাল অনবদ্য ' এ কেবলমাত্র নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খেয়েছে ·.লেই তা নয়, নাটক ছাড়াও একক গান হিসেবে সার্থক ভাবে চলে। এ গানের রূপ-কল্পনা, কথাবস্তু, সুরের ভার বাঙালীয়ানা সব মিলে বিদেশী ছোঁয়া লাগিয়েও স্বতন্ত্র, দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানের চাল অবশ্য অন্যরকম, কোনো অংশ ঘুরে ফিরে সকলে মিলে গাওয়া হয়,—আবার সমগ্র গানটি সম্মেলক কণ্ঠে গীত হলেও বৈশিষ্ট্যের হানি হয় না। গানের নির্দেশে দেখা যায়, যে-যে অংশ সকলে মিলে গাইতে হবে সেই সেই অংশে 'কোরাস' বলে উল্লেখ করা আছে। প্রাচীন পাশ্চাত্য

রীতিও ছিল তাই। যেমন আমাদের কবিগান, তরজা বা পাঁচালিতেও আছে, এক-এক অংশের এক-এক গায়নরীতি। সম্মেলক অংশে 'ধূয়া' লেখা থাকে, প্রথম অংশ মূল গায়েন গেয়ে যান আর তাঁর সঙ্গীরা ধূয়া ধরেন।

আমাদের গতানুগতিক সমবেত গীতপদ্ধতি আলোচনা করলে মোটামুটিভাবে দেখি যে বেদগান থেকে শুরু করে লোক-সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে তা চলে এসেছে শ্রেণীবদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ চালে। তারপরেই রবীন্দ্রযুগের অভিনবত্ব। এর আগে সুচিন্তিত মিশ্রণ বা নবীনতর ভঙ্গি আনবার ঝোঁক দেখা যায় না। সম্মেলক গান উদ্দীপনার জন্য বা নাটকের প্রয়োজনে কাজে লেগেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি-সীমানা আবদ্ধ না রেখে সম্মেলক গানকে নানান কাজে লাগালেন, নানান চালে চালালেন। এখানেও সঙ্গীতকে তিনি মুক্তি দিলেন গতানুগতিকতা থেকে। মাত্র একটি কোনো ধারাকেই শেষ কথা বলে তিনি মেনে নিলেন না। সুরের মিশ্রণের সঙ্গে তাল রেখে যেখানে যতটুকু অংশ সমবেতভাবে গাইলে পরিবেষণের মাধুর্য বাড়ে তিনি সেই-ভাবে গানকে সাজালেন। বেদগানের ছাঁচে কিছুটা ঢাললেন, কিছুটা নিলেন বাংলার এবং বাংলার বাইরেব লোকসঙ্গীত থেকে, কিছুটা নিলেন ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে। ফলে আমরা রাগভিত্তিক ধ্রুপদাঙ্গ কোরাস গেয়ে করলাম উপাসনা, করলাম উৎসবানুষ্ঠান; বিচিত্র রাগের কোরাস গেয়ে পেলাম নিছক আনন্দ, নূতন রসের সন্ধান। গানের মধ্যে কথা আর সুরের যে বৈচিত্র্য, কোরাসের বেলাতেও তেমনি গায়ন পদ্ধতির বিচিত্রতা। একই গানের মধ্যে সুরের মাধুর্য এবং কথার ভাবার্থ অনুযায়ী গানের কোনো অংশ একক, কোনো অংশ দ্বৈত, আবার কোনো অংশ বহুজনে মিলে গাওয়া হয়। ফলে 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে', 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে', 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে', 'এই তো ভালো

লেগেছিল আলোর নাচন' প্রভৃতির মতো কাব্যধর্মী গানও বিচিত্রতায় রসসমৃদ্ধ হল, গান বা কবিতা হিসেবে এগুলির একঘেয়েমিও গেল ঘুচে।

রবীন্দ্রনাথ সম্মেলক গানের পদ্ধতিতে নূতনত্ব এনে তাকে এই যে মুক্তি দিয়ে গেলেন তার ফলে আরেকটা বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্রও খুলে গিয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানে তান বিস্তার বা কারিকুরির পক্ষপাতি, এবং রবীন্দ্রনাথ আর নতুন গান লিখবেন না বলে যাঁরা নূতনত্বের অভাব বোধ করেন তাঁরা অন্তত রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে বিভিন্ন সম্মেলক ভঙ্গিতে গেয়ে নবীন রসের সন্ধান পেতে পারেন। আর যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞরা পেতে পারেন সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের নূতন নূতন গৎ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত এমন গান প্রায় নেই বললেই চলে যেগুলিকে নাটক থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে আলাদা ভাবে একক গানের মর্যাদায় গাওয়া না চলে। একই গান পরিবেশের পরিবর্তনে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। সম্মেলক সঙ্গীতের বেলায় রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সেটি আয়ত্ত করা সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষে বেশি কঠিন নয়। এবং সুর তালের পরিবর্তন না করে গানের চালে নূতন ভঙ্গি এনে কোরার্স গানের পরিবেষণে অভিনবত্ব আনা সম্ভব। কোন কোন গান সম্মেলক ভাবে গাওয়া চলে তা স্থির করে নেওয়াও কঠিন নয়। যন্ত্রসঙ্গীতের বেলাতেও এই একই পদ্ধতিতে নূতন রস পরিবেষণ করা এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অর্কেষ্ট্রা বাদন সম্ভব। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে আরেকটি নূতন জিনিস দিয়েছে। নাচে, গানে এবং অভিনয়ে পরিপূর্ণ রস-সমারোহকেই বলে সঙ্গীত। প্রাচীন কোরাসেও এই ছিল রীতি। গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের মধ্যে একক, দ্বৈত এবং বহুকণ্ঠে গীত গান, নাচের তালে তালে পূর্ণতর সঙ্গীত-রস নিয়ে প্রকাশিত। কথাকলি নাচের মুদ্রাবহুল ভঙ্গি, কথক ও ভারতনাট্যমের বোল সহযোগে নৃত্যরীতি

এবং মণিপুরী নাচের গীতছন্দময়তা সব মিলে মিশে রবীন্দ্র-নৃত্যে এক হয়ে যথাযথ ছবি ফুটিয়ে তোলে মনে। এখানেও দেখতে পাই শুধু নাচেই তার শেষ নয়, গানের বাণীকে নাচের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাতেই তা সার্থক। এবং 'চণ্ডালিকা'র নিতান্ত গদ্যছন্দের গানও নৃত্য এবং গীতের ছন্দোবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান সংকলন করে একদিকে যেমন সুরে এবং বিষয়বস্তুর ভার-সামঞ্জস্যে নূতন নূতন সঙ্গীতক্রম দানা বেঁধে উঠতে পাবে, অপরদিকে তেমনি তার সঙ্গে নৃত্য সহযোগেও নূতন নূতন ভঙ্গির প্রকাশ সম্ভব হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'শাপমোচন' প্রভৃতির ক্ষেত্রে এইভাবে গানের পর গান বেঁধে কিছু কিছু সমগ্র সঙ্গীতক্রম তৈরী করেছেন। এখন সুযোগ্য কোনো ব্যক্তি সেই রকম গীতক্রম খাড়া করে বৈচিত্র্যময় গীতগাথা তৈরী করতে পাবেন বলে মনে হয়। এইভাবে সম্মেলক গানের মধ্য দিয়ে—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সীমান্ত বিস্তৃততর এবং গীতরস বিচিত্রতর হয়ে উঠতে পারে। অপরপক্ষে এই পদ্ধতির সুরমিশ্রণে সৃষ্টি হতে পারে রাবীন্দ্রিক অর্কেষ্ট্রার।

রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের গান অন্তরের অন্তস্থল থেকে উদ্ভূত হয়, ইউরোপীয় সঙ্গীতের মতো তা সমাজের মধ্য থেকে—জীবন লীলার সূত্রে আসে না। সেই জন্যই আমাদের সঙ্গীতে হাসির গান বা ঐ জাতীয় চপল চালের চলন নেই। আজকাল এই ধরনের যে সব গান দেখা যায় তা অনেকাংশেই ইউরোপের অনুকরণে রচিত। 'আধুনিক' বাংলা গানের মধ্যে এটা বেশি করে দেখা যায়,—যেখানে গানের উদ্দেশ্য শুধু সাময়িক আনন্দ দান, তারপরে তার আর কোনো মূল্য থাকে না। আমাদের সামাজিক রীতিনীতির অঙ্গ হিসেবে যে সব গান বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে সেগুলি ইউরোপীয় অনুকরণ না হয়েও হাসির, কান্নার বা উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে সব হাসির গান লিখেছেন তার সঙ্গে ইউরোপীয় রীতির তুলনা করা গেলেও একথা সত্য, যে সেগুলি পুরোপুরি আমাদেরই জলমাটির। কৌতুক-কবিতার যখন এদেশে বরাবরই চলন ছিল তখন কৌতুক-গীতি কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত পক্ষে কবিগান, তরজা, যাত্রার গান প্রভৃতিতে তার সাক্ষাতও প্রচুর মেলে। তবে মূল কথাটা এই যে ভারতীয় রাগ-রাগিণী বা সঙ্গীতের ধারা গভীরভাবে অন্তর্মুখী বলে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি এতে প্রতিবাহিত হয় না। বরঞ্চ ব্যক্তিগত গানও সর্বজনীন রূপ পায় এবং মানবোত্তর উপলব্ধির রসাকাশে উড্ডীন হয়। সেই জন্যই হাসির গান অথবা উদ্দীপক গান বা নানান ধরনের সামাজিক সমারোহের গান হাল আমলের সৃষ্টি,—এবং স্বভাবতই রাগ-রাগিণীর ছায়ামাত্র অবলম্বন করে দেশজ ও বিদেশী সুরের মিশ্রণে তৈরী। এই জাতীয় গান

সুবের চিরায়ত রেশ রেখে যায় না, সাময়িক সুরবিস্তারের মোহ সৃষ্টি করে মাত্র। এই দিক থেকে চিন্তা করলে মার্গসঙ্গীতে বাণীরূপেব অকিঞ্চিৎকবতাব সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরীদেব মধ্যে একাধিক গীতকার নানান সাময়িক উপলক্ষ্য নিয়ে গীতরচনা করেছেন। তবে সেই ধারা ক্ষীণ ছিল, কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে তবেই আমরা সমাজ চেতনা এবং জীবনবোধেব একটা নূতন রূপ দেখতে পাই যা ক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাদেশিকতার হাওয়া লেগে ফুলে ফেঁপে উঠল। এই যুগে বহু গীতকার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করলেন। ববীন্দ্রনাথও লিখলেন দেশমাতৃকার বন্দনা গান। নানান অনুষ্ঠানে গীত 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন', 'হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', 'আমবা মিলেছি আজ মায়েব ডাকে', 'আমাদের যাত্রা হল শুরু', 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো', 'ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' প্রভৃতি গান সে যুগে প্রতিটি প্রাণে জাগিয়ে দিত মুক্তিব আশ্বাস, ধমনীতে ধমনীতে বইয়ে দিত সংকল্পেব জোয়ার। একদা গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষী গানে নাটকে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করে গিয়েছেন। তারপরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর দেশাত্মবোধক নাটকে জাতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন—যে সব গান সেদিন দেশের সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। রজনীকান্ত সেন রচনা করেছেন, 'সেথা আমি কী গাহিব গান' প্রভৃতি গান। অতুলপ্রসাদ লিখেছেন, 'মোদের গরব মোদের আশা' প্রমুখ সঙ্গীত। আর উদ্বোধক গানের আগুন ছড়িয়েছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম।

আজ আমরা বিদেশী সমাজের নকলে জাঁকজমক করতে গিয়ে নিজেদের ঐতিহ্যের কথা ভুলতে বসেছি। তা নইলে কেবলমাত্র সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের লোক-সঙ্গীতের জগতেও রয়েছে আনুষ্ঠানিক গানের প্রাচুর্য। বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে নানারকম পূজা-পার্বণ ব্রত-বিয়ে ইত্যাদি উপলক্ষ্যে গানের ছড়াছড়ি। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের সর্বত্র এই ধরনের লোকগাথার সাক্ষাৎ মেলে, পারিবারিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যেগুলি গাওয়া হয়। আমাদের যে কোন অনুষ্ঠানকেই সুন্দর করে তুলবার জন্য সুরের এই ভূমিকা। ইউরোপের বিবাহ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে যে ধরনের গান গাওয়া হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের অনুরূপ গানের প্রভেদ আছে। ওদেরগুলো হয় সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরাজ করে, না হয় বড় বেশিরকমের ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। অর্থাৎ জীবনের বিশেষ বিশেষ পর্বে মানুষকে তারা ভগবানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে এবং সেই বিরাট মহিমার ছায়ায় নিজেদের অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে; আবার তেমনি জীবনের সাধারণ স্তরের সঙ্গীতে একেবার দৈনন্দিন চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার সুর তোলে।

আমাদের দেশের গানে সুরসরস্বতীকে আমরা ততটা নামিয়ে আনতে পারি না বটে, এবং গানের রসকে সুরে আর কথায় দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে তুলে যদিও ধরি, তবুও লোক-সঙ্গীতের আনুষ্ঠানিক অংশে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়, এবং স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায়। সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমষ্টিগত জীবনের ভাল-মন্দ প্রতিফলিত হয়। এমনকি, দেবদেবীকেও আমরা একেবারে ঘরোয়া পর্যায়ে এনে ফেলি এবং আমাদেরই আপনজন করে তুলি। পূজা-পার্বণের ব্রতকথায় লাগে নিজ নিজ স্বপ্নের ছোঁয়া, বিয়ের গানে দেখি

পারিবারিক সম্পর্কের বিচিত্র সুর, ফসল কাটা প্রভৃতি গানে পড়ে সাংসারিক পূর্ণতার ছায়া। এমনি করে ভারতীয় সঙ্গীতের নৈর্ব্যক্তিক অংশের পরিপূরক লোক-সঙ্গীতের এই শাখার ব্যক্তিক

রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গানের বিস্তৃত অঙ্গন বৈচিত্র্যের আলোছায়ায় আন্দোলিত। নৈর্ব্যক্তিকতার দেখা যেমন মেলে সেগুলিতে তেমনি আবার ব্যক্তিগত অনুভূতিতেও ভরা। উৎসবের প্রয়োজনে রচিত হলেও উৎসবকে ছাপিয়ে এক বিশালতর রসের ক্ষেত্রে তার বিচরণ। এগারোই মাঘের মাঘোৎসব অথবা সাতই পৌষের পৌষোৎসবে উপাসনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় সঙ্গীতের বড় একটা অংশের সৃষ্টি, আবার,—বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে,—প্রতি বৎসরে ঋতুবন্দনার সূত্রে এই গীত-প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক ভিত্তিতে কিছু গান অবশ্যই আছে, যেমন—'দিনান্তিকা' চা-চক্র উপলক্ষ্য করে রচিত 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়, চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল চল চল হে'; কিংবা গৃহপ্রবেশ জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য 'এসো হে গৃহদেবতা', সুধীজনের আবাহনে 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল'; অথবা এককালে (১৩৪২) শান্তিনিকেতনের হৈ হৈ সঙ্ঘের 'ভরসামঙ্গল' উপলক্ষ্যে লেখা 'ও ভাই কানাই কারে জানাই', 'কাঁটাবন বিহারিণী সুরকানা দেবী', 'নাচ-গান-গাওয়ার দল রে মোরা' প্রভৃতি কৌতুক গীতিগাথা। কিন্তু কতকগুলি গান আছে, সংখ্যায় যা নগণ্য নয়, যেগুলি কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে রচিত অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হলেও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে নি,—এমন কি 'গীতবিতান' গ্রন্থেও এগুলিকে ঐ শ্রেণীভুক্ত করে রাখা হয় নি। যেমন, 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে' গানটি মানবপ্রেমিক এণ্ড্রুজ মৃত্যুর স্মারক হলেও এটিকে সাধারণভাবে প্রেমের গান

বলতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই। তেমনি 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান', 'হে আকাশবিহারী নীরদ-বাহন জল' প্রভৃতি আরো অনেক গানেরই সাক্ষাৎ মেলে যেগুলি বরঞ্চ কোনো উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল শুনলেই একটু অবাক লাগে।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনেক গান আছে যেগুলির বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ব্যবহার বিচিত্র রকমের। 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানটি শান্তিনিকেতনে জাপানী জুজুৎসু বীর টাকাগাকির জুজুৎসু শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষ্যে গীত হয়েছিল নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের জুজুৎসু প্রদর্শনীতে (১৯৩১-এর ১৬ই মার্চ)। 'এস এস হে তৃষ্ণার জল' এবং 'হে আকাশ-বিহারী নীরদ-বাহন জল' গান দুটি শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়েছিল (১৩২৯)। 'শুভকর্মপথে ধর নির্ভয় গান' এবং 'চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে' গান দুটি গীত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ দেবার সময়ে (১৯৩৭ ইং)। 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন' গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধনে (১৯১৭ ইং); এবং 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ' এই পরিবর্তিত রূপে গীত হয় রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফে উপাধিদান উপলক্ষ্যে (১৯৪০ ইং);—গানটি অনুরূপ কোনো অনুষ্ঠানে এখনো শান্তিনিকেতনে গাওয়া হয়। এই গানটির আদিরূপ বরোদার গাইকোয়াড়ের অভ্যর্থনায় রচিত 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন' গানটির উদ্ধৃতি শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 'অগ্নিশিখা এসো এসো' গানটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনের গার্ল গাইড—রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছিলেন 'সহায়িকা'—তাদের জন্য (১৩৩০); এখন এটি শ্রীনিকেতনের শিল্পোৎসব এবং সাধারণভাবে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে প্রদীপ জ্বালবার সময়ে গাওয়া হয়,—যেমন এই সেদিনে গাওয়া

হল রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের 'বিচিত্রা' ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব রকমের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই গান লিখেছেন, তার অধিকাংশই শান্তিনিকেতনের নানাবিধ উৎসব এবং ক্রিয়া-কর্মকে কেন্দ্র করে। সংখ্যায় অবশ্য বিয়ের গানই অনেক, যেগুলি পারিবারিক বিবাহ উৎসবে অথবা বন্ধু-বান্ধব স্বজন-পরিজনের অনুরোধে লেখা। বিয়ের গান বেশি হবার কারণ নিশ্চয়ই এই যে ব্রাহ্মমতের বিবাহে মন্ত্রাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গীতও প্রচলিত রীতি। অন্যান্য হিন্দুমতের বিবাহে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, স্ত্রীআচারের একটি পর্বমাত্র বলা যায়। গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের বেলাতেও এই একই রীতি। বিবাহোৎসবের গানে লক্ষণীয় যে ইংরেজদের গীর্জায় গীত স্তোত্রগানের মতো এগুলির বাহ্যিক আবেদন ভগবানের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা এবং সুখ-শান্তিময় জীবনের জন্য প্রার্থনা। এর মধ্যে সাংসারিক সুর অবশ্যই আছে? তবে তাও পূজা নিবেদনের ভঙ্গিতে। অল্পবয়সের রচনা 'আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে রে' অথবা 'মধুর মিলন' গানগুলি নিশ্চয় ব্যতিক্রম হিসেবেও উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই।

শান্তিনিকেতনের বিশেষ অনুষ্ঠান 'বৃক্ষরোপণ' ও 'বসন্তোৎসব' এবং শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ' ও 'শিল্পোৎসবে'র জন্য রবীন্দ্রনাথ শুধু যে গানই লিখেছেন তা নয়, পুরো কার্যক্রমই তৈরী করতে হয়েছে তাঁকে। বৃক্ষরোপণ উৎসবে 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' গানটি নৃত্যসহযোগে গাইতে গাইতে গাছের চারাগুলিকে উৎসব স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপরে গাওয়া হয় 'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল' এবং 'কোন পুরাতন প্রাণের টানে ছুটেছে মন মাটির পানে' গান ছুটি। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা নিবিড় যোগ আছে। নগর পত্তনিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে বৃক্ষসম্পদ লোপ পায় এবং তাতে যে পৃথিবীর শ্যামল রূপটা ঢাকা পড়ে,

অথবা গাছ যে আকাশ থেকে বারিকণা আকর্ষণ করে মাটির সজীবতা রক্ষা করে,—শুধু এইটাই বৃক্ষরোপণের মর্মকথা নয়, গাছের সবুজ পত্রসম্পদ, ঋতু পরিবর্তনের পর্বে পর্বে ফুলে ফলে নূতন নূতন পাতায় রঙের বিচিত্রতায় প্রাণচাঞ্চল্যের একটা বিশেষ রূপ ফুটে ওঠে, এবং এই জীবন্ত ছোঁয়ায় শিশুর বা বয়স্ক মানুষের মনের কোমলতা সজীবতার অলক্ষ্য যোগসূত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারা এবং পরিবেশের মধ্যে তৃণলতা বৃক্ষাদির একটা ভূমিকা আছে,—শিশুমন এর থেকে প্রাণরস আহরণ করে, মানসিক উজ্জ্বলতা লাভ করে। বৃক্ষ-বন্দনার মন্ত্রে এই বাণীরই প্রতিধ্বনি।

'হলকর্ষণ' উৎসবে গানের দল উপকরণাদি নিয়ে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি গেয়ে উৎসব-প্রাঙ্গণে আসে, এবং উৎসব শুরু হয় 'আমরা চাষ করি আনন্দে' গানটির সঙ্গে। তারপরে 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন', 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর' প্রভৃতি কোনো গানও গীত হয়। 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব প্রথম হয়েছিল ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই, এবং 'হলকর্ষণ' উৎসব প্রথম হয়েছিল তার পরের দিন। এখন এ দুটি উৎসব হয়ে থাকে যথাক্রমে ২২শে শ্রাবণ এবং ২৩শে শ্রাবণ। ১৯৩৯-র 'হলকর্ষণ' উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। "পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে। অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে কিছু দিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে

হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক মাতৃ-ভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব। আজকের অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাবনিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে-বিদ্যা, মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্বোধনে আনন্দ-স্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।”

শান্তিনিকেতনে আরো বিচিত্র যে সব উৎসবানুষ্ঠান হয়ে থাকে তার মধ্যে আরো দুটির নাম এখানে করব। বিশ্বকর্মা পূজার দিনে শ্রীনিকেতনে যে শিল্পোৎসব হয়ে থাকে তাতে ‘যিনি সকল কাজের কাজী’ গানটি গেয়ে নাচের দল আসে উৎসব-প্রাঙ্গণে। এই অনুষ্ঠানে অন্য যে সব গান গাওয়া হয় সেগুলি হল ‘অগ্নিশিখা এস এস’, ‘সব কাজে হাত লাগাই মোরা’, ‘কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন’, ‘নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র’ ইত্যাদি। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ‘বসন্তোৎসব’। দোলের দিনে অনুষ্ঠিত এই উৎসবটি রঙে-রসে আকর্ষণীয়। ফুলের মালায় সেজে আবীরের ভারা নিয়ে নাচের দল ‘ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল’ গানটি গেয়ে উৎসবাঙ্গনে আসে। তারপরে ‘ওগো কিশোর আজি’, ‘আজি দখিন দুয়ার খোলা’ প্রভৃতি আরো অনেক যে-গানের মধ্যে অনুষ্ঠানটি জমে ওঠে সেগুলি বসন্ত ঋতুরই বিবিধ গান, যেমন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে বিবিধ ঋতুসঙ্গীত। বসন্তোৎসবের সমাপ্তি-সঙ্গীত ‘যা ছিল কালো ধলো, তোমার রঙে রঙে রাঙা হোলো।’ এছাড়া আছে গৃহপ্রবেশ জাতীয় সাময়িক অনুষ্ঠান, যার গান হল ‘এসো হে গৃহদেবতা’, ‘আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ দীপখানি জ্বালো হে’ ইত্যাদি। একটা আশ্চর্য জিনিস এই যে একেবারে উৎসবের প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক ভাবে না লিখলেও প্রায় প্রতি উৎসবেরই উপযুক্ত গান রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ভাণ্ডারে খুঁজে পাওয়া যায়। এর কারণই হল উৎসবকে কেবলমাত্র

অনুষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যে না দেখে আরো বড় করে সমাজের এবং জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। তাই অনুষ্ঠান থেকে যেমন আমরা যেতে পারি ব্যাপকতর অঙ্গনে, তেমনি সেই বিস্তীর্ণ অঙ্গন থেকেও এসে দাঁড়াতে পারি অনুষ্ঠানের আপাত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে।

এবং খুব সম্ভবত এই কারণেই শান্তিনিকেতনের বা শান্তি-নিকেতনের বাইরের বিশিষ্ট উৎসব নববর্ষ এবং বর্ষশেষ,—এবং আরো উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান জন্মোৎসব, এবং মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ করে লেখা কোনো গান রবীন্দ্রনাথের গীতভাণ্ডারে বড় একটা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত রীতির সূত্র ধরে এই সব উৎসবানুষ্ঠানে উপাসনার প্রবর্তন। এবং সেই প্রসঙ্গে যে ধরনের গান ব্যবহৃত হয় তার আবেদন চিরন্তন, সেগুলির ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিশেষই সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। নববর্ষ উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানই গাওয়া হয়ে থাকে, তবে নিছক বর্ষবরণ হিসেবে তিনি কোনো গানই লেখেন নি বলা চলে। তাই ‘এসো হে বৈশাখ’ জাতীয় ঋতু পর্যায়ের গান যেমন এতে স্থান পায়, তেমনি স্থান পায় ‘ওরে নূতন যুগের ভোরে’, ‘জয় হোক, নব অরুণোদয়’ প্রভৃতি পূজা-পর্যায়ের গানও। এই একই কথা বর্ষশেষের অনুষ্ঠানের বেলাতেও। বর্ষশেষ ও নববর্ষ যেন মিশে গেছে মৃত্যু ও জন্মের মধ্যে, প্রভেদ নেই প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবন বিবর্তনের। একটি বছরের শেষ এবং আরেক নূতন বছরের প্রকাশের মধ্যে জীবনের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক পদপাতই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। তাই ‘আঁধার এল বলে’, ‘দিন অবসান হল’, ‘পূর্বাচলের পানে তাকাই’ প্রভৃতি গানের সঙ্গে বর্ষ-বিদায়ের মধ্যেও নবীনের বরণ। বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের কিছু অংশ থেকে এই সত্য ধরা পড়ে। তিনি বলছেন, “যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার। আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে অতি নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।"

জন্মোৎসবের জন্যও নিজেকে উপলক্ষ্য করে 'হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' গানটি ছাড়া আর কোনো বিশেষ গান রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি। 'ঐ মহামানব আসে' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের স্মৃতি বিজড়িত, কিন্তু এটি আসলে নববর্ষের গান—মানবের জয়গান হিসেবে রচিত। জন্মদিনের গান হিসেবে 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়', 'হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে', 'জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয়', 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার', 'নূতন প্রাণ দাও' প্রভৃতি অনেক গানই গাইবার রেওয়াজ আছে। তেমনি মৃত্যুদিনের গানও। রবীন্দ্রনাথ যদিচ মৃত্যুর গান আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে বিশেষ লেখেন নি, তবে 'ডাকঘর' নাটকের জন্য শেষ জীবনে রচিত 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি নিজের মৃত্যুর পরে গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে শোনা যায়। 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়' গানটি বড় মেয়ে মাধুরীলতার মৃত্যুতে (১৩২৫) লেখা ; এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে লেখা 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গানটি। এণ্ডরুজ সাহেবের মৃত্যুতে লিখেছিলেন 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে' গানটি। 'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর' গানটি লেখা হয়েছিল বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ; এ গানটি এখন শান্তিনিকেতনে প্রতি বছর পরলোকগত আশ্রম-বন্ধুদের স্মৃতি-বাসরে গাওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে 'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই', 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু', 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে', 'নয়ন ছেড়ে গেলে চলে' প্রভৃতি অনেক গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই সূত্রেও লক্ষণীয় জন্ম ও মৃত্যুর প্রতি

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি,—যা গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে, এবং একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যার মধ্যে মূলত কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনি একবার উপাসনার ভাষণে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আরেকদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আরেক জন্ম সকলকে নিয়ে।" মৃত্যু উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, "মৃত্যু বড়ো সুন্দর, বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণস্থিতিকে বিচলিত করে।"

রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গানের অন্যান্য পর্বের মধ্যে আছে সভা-সমিতির আবাহন-গীতি 'সবারে করি আহ্বান', 'সফল করো হে প্রভু আজি সভা' প্রভৃতি গান; সংকল্পবাচনের গান রয়েছে 'মোরা সত্যেব পরে মন আজি করিব সমর্পণ'। জাতীয় সঙ্গীত 'জন গন মন অধিনায়ক' গানটি লিখেছেন কংগ্রেসের সভার জন্য। স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবসে ব্যবহৃত পতাকা নমস্কারের গান 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। এবং সবশেষে উল্লেখনীয়, এখানকার সব উৎসব অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে রয়েছে আশ্রম-সঙ্গীত 'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।'

রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গানের সূত্রপাত প্রধানত শান্তি-নিকেতন আশ্রমের বৈচিত্র্য ও রুচিরূপের প্রতি লক্ষ্য রেখে। শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের বাহ্যিক রূপ দেবার জন্যই গানগুলি রচিত নয়, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীবনের সুষম রূপ ফুটিয়ে তোলাতেই সার্থকতা। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখি আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতগুলিও

রবীন্দ্র-গীতধারার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গান যেমন অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে গাইলেও বেমানান হয় না, তেমনি সমগ্র রবীন্দ্র-গীতিগুচ্ছের মধ্য থেকে যে কোন অনুষ্ঠানের উপযোগী মনোমত গান খুঁজে নিতেও অসুবিধা হয় না। সুরের মধ্যও স্বাতন্ত্র্য বড় একটা আবিষ্কার করা যাবে না। মোট কথা, বাণী আর সুর মিলে মিশে এই গানগুলিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চিরন্তন রূপটিকেই প্রকাশ করে, যার ফলে উৎসবকে আমরা শুধু অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখি না,—আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে জীবনের সঙ্গেও এক করে নিই।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান

গদ্যগান,—কথাটা শুনলে একটু চমকে ওঠা অসম্ভব নয়। কবিতার ছন্দ নেই মিল নেই, অথচ গান,—বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, গানের পক্ষে গদ্য শুধু সম্ভবই নয়, সুষ্ঠু সাবলীল এবং সহজতর মাধ্যম। পদ্য ছন্দের সঙ্গে সুর তাল বরাবরই হাত ধরাধরি করে চলে, পরস্পারের ওজন বুঝে মেপে মেপে চলে। এবং চলবেও। সুর তাল মিলিয়েই হবে গান, আর কবিতা বরাবরই হবে তার বাহন। তাহলে গদ্য গানের সপক্ষে যুক্তিটা কোথায় ?

যুক্তি বিচারের শুরুতেই ভেবে দেখতে হয় গানের সুর-রূপের সঙ্গে তার বাণী-রূপের. সম্পর্কটা কোন ধরণের। গানের সুরের সঙ্গে কবিতার ছন্দের বা মিলের অভেদ সম্পর্ক কিছু নেই। সুর অনির্বচনীয়। এমন এমন হিন্দি গান অনেক পাওয়া যায় যেখানে এক পংক্তি দু পংক্তির বোলের মধ্যে কাব্যিয়ানা কিছু নেই, অথচ শিল্পীর গীতভঙ্গিতে অনবদ্য হয়ে ওঠে গান,—এমন কি সেই অতি সাধারণ কথাটুকুর মধ্যেও লাগে অনির্বচনীয়তার ছোঁয়া, মনে হয়, বুঝি এত সহজ বলেই এত মর্মস্পর্শী। যেমন ধরুন, 'বাজে ঝননন মেরে পাঁয়োরিয়া, কৈস করো যাউ ঘরোয়া রে' কিংবা 'বাজু-বন্দ খুল খুল যায়, সাঁবরিয়া নে যাদু ডালা।'

কিন্তু বাংলা গান কথা আর সুর দুয়ে মিলেমিশেই সার্থক। তাই এক্ষেত্রে কথাকে এড়িয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সেই কথার ছন্দকেও এড়িয়ে যাওয়া। ছন্দ বলতে আমরা সাধারণত কবিতার ছন্দই বুঝি। সেই ছন্দকে গীতছন্দে রূপায়িত করা সহজ, এবং সেটাই রীতি। সুরের কাঠামোর সঙ্গে কাব্যের কাঠামোকে মাপে মাপে মিলিয়ে দেওয়া,—ঠাট বজায়

রাখা। সুরের সঙ্গে বাগর্থের সঙ্গতি রেখে চলবার চেষ্টা। কিন্তু অর্থ বজায় রেখে চলা আর সুরকে ছন্দে তালে নির্ভুল রাখা যেন বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির বিরোধ। তাই বাংলা গানের বিশেষত্ব বজায় রাখবার জন্য এই দুই অনুভূতির সমতা রক্ষা করে চলবার একটা সহজতর মাধ্যম হলেই সুবিধে।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও সঙ্গীত রচনার ক্রমিক সাধনায় কাব্যকে প্রচলিত ছন্দ থেকে আর সঙ্গীতকে তালের গতানুগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে এসেছেন। কবিতার আদিযুগে মাইকেল মধুসূদন করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, কবিতাকে অন্ত্য মিল থেকে মুক্ত করে সীমায়িত কাঠামোর মধ্যেই হ্রস্ব দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগে তিনি ভাবকে দিয়েছিলেন অবাধ গতি। কাব্যের উপযুক্ত শব্দ চয়নেও তাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো; ভাষায় জোর আনবার জন্য ভারী ওজনের শব্দ চয়ন। এই শব্দ চয়ন ব্যাপারটা লক্ষণীয়। কেননা কাব্যের গুরুত্ব অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হওয়া দরকার। পদ্যকাব্যে যে ভাষা চলে গদ্যকাব্যে সে ভাষা অচল। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', 'পলাতকা' থেকে শুরু করে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত, এবং 'পরিশেষ' পার হয়ে 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'শেষসপ্তক' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থের বিচার করলে দেখা যাবে পয়ারের বিবর্তনে মুক্তক ছন্দের প্রয়োগ যেমন তিনি করেছেন তেমনি মুক্তকছন্দ থেকে গদ্যছন্দ পর্যন্ত এসে ভাষা রচনা এবং শব্দ যোজনাতেও তিনি ক্রমশ আটপৌরে হয়েছেন।

গদ্যগানের প্রসঙ্গে আসবার আগে কাব্যরচনায় পদ্যছন্দ থেকে গদ্যছন্দ পর্যন্ত যাত্রাপথের জরিপ করে দেখা দরকার। প্রাচীন যুগে কাব্যই ছিল সাহিত্যের প্রধান বাহন। তখন কাব্য ছিল মোটা-মুটি ভাবে শোনার জিনিস। আসরে-বাসরে কবিতার আবৃত্তি হত, গানের মজলিশ বসত। কবিতার আবৃত্তি চলত গানের সুরে; গানের পর গান জুড়ে কবিতার পালা। ক্রমে এল গদ্যের

যুগ। সৃষ্টি হল ছাপাখানার। মানুষের ক্রিয়াকর্মের পরিধি গেল বেড়ে। গদ্য তার আসন কায়েমি করে নিল। পদ্যও হয়ে উঠল কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখে দেখার জিনিস।

গদ্যের সঙ্গে পদ্যের প্রধান তফাত প্রথমত আকারগত, দ্বিতীয়ত ভাবগত। পদ্যের পংক্তি অক্ষরের হিসাবে এবং ছন্দের প্রয়োগে সীমাবদ্ধ। গদ্যের তা নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়।" কিন্তু কথা থাকলেই অর্থ থাকে, তা পদ্যে হোক গদ্যে হোক। তাই লক্ষ্য রাখা দরকার অর্থটা যেন রসমূলক হয়। গদ্যের ক্ষেত্র মানুষের বুদ্ধি, পদ্যের হৃদয়। তবুও গদ্যের মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন ছন্দ আছে। গদ্যও রচনা বিশেষে কাব্য হয়ে উঠতে পারে। আবার পদ্য অনেক সময়ে ছন্দ, ধ্বনি প্রভৃতির নিয়ম মেনে চলেও কাব্যের পর্যায়ে ওঠে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গদ্য বা পদ্য যে বাহনে ভর করেই চলুক, 'কাব্য' এক স্বতন্ত্র জিনিস। রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে হয় পদ্যকাব্য, গদ্যে বললে গদ্যকাব্য।

সাধারণ কথার মধ্যে ছন্দ এনে তাকে আমরা বিশেষ একটা গতি দিই। সেই কথা তখন অর্থের চেয়েও বেশি কিছু প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ছন্দের সঙ্গে অছন্দের তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর একটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না।" কিন্তু গদ্যকে যদি কাব্যের মতো করে রূপায়িত করা যায় তবে তার মধ্যে ব্যবহারিক গদ্যময়তার অতীত কোনো রস প্রকাশ পায়। কাব্যের পদ্যময় ভাষার মধ্যে যে ওজনবোধ আর সংযম দেখি সেটাই ছন্দ। সেই ওজনবোধ বা সংযতরীতি গদ্যের মধ্যেও নিয়ে আসা সম্ভব। ভাষারীতির মধ্যে থাকে বাক্ ও বাগর্থ, এবং ভাব প্রকাশের ভঙ্গি। ছন্দোবদ্ধ রচনার মধ্যে এই সঙ্গে আসে ধ্বনি। গদ্যের পর্ববিভাগ সাধারণত ভাবগত, পদ্যের ধ্বনিগত। কিন্তু কাব্যরচনায় এই

চারিটির সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না, একটা থেকে আরেকটা বেশি প্রাধান্য পেয়ে যায়। পদ্যরচনায় শব্দযোজনার এবং ভাবপ্রকাশের সমান স্বাধীনতা থাকে না ; ছন্দের বন্ধন মেনে চলতে হয়। গদ্যে এই বন্ধন নেই বলে রচয়িতার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা দেখা যায় বেশি।

ভাব প্রকাশের এই স্বাধীনতা বজায় রাখতে গিয়েই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ তৈরী করেছিলেন। তারপরে পয়ারকে ভেঙ্গে অসম মাত্রার পংক্তি এনে কাব্য রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং পরিণামে ছন্দের এই বন্ধনটুকুও ছিন্ন করে ধ্বনিগত ছন্দের আভাষ-মাত্র রেখে ভাবগত ছন্দ রচনার প্রয়াসী হলেন। জন্ম নিল গদ্যছন্দ বা গদ্যকাব্য।

গদ্যছন্দের কোনো ব্যাকরণ তৈরী হয় নি। কিন্তু তবু আমাদের, কানে এর একটা ছন্দরূপ ধরা পড়ে। গদ্যছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভাবছন্দ। পদ্যছন্দের বাঁধনও রূপের দিকে, ভাবের দিকে তাব মুক্তি। ভাবের দিকের এই মুক্তি আরো বেগ পায় যদি ছন্দের দিক থেকে তাকে আরেকটু বেশি মুক্তি দেওয়া যায়। গদ্যছন্দ সেই মুক্তির পথে আবেক পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবাব নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতেঃ ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে-ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে-ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই, অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের মনকে

বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে।' (গদ্যছন্দ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১শ খণ্ড। পৃঃ ৩৬৬)।

কিন্তু তবুও গদ্যকবিতার ধ্বনিরূপকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও গদ্যের নিছক আটপৌরে ভাষা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকাব্যে ব্যবহার করেছেন, তবু তার মধ্যেও শব্দচয়নের এবং ভাষাযোজনার পরিমিত ভঙ্গি লক্ষ্য করি। কাব্যরচনায় এ হতেই হবে। সঙ্গীতে হয়তো না হলেও চলে;—কেন, তা পরে বলব। গদ্যকবিতার মধ্যে ছন্দের যে আভাষ বা ঝঙ্কার তা পদ্যকবিতার মতো নিয়মিত নয়, সাধারণ গদ্যের মতো খেয়ালীও নয়, তা কাব্যের সর্বাঙ্গে ওতপ্রোত। ছন্দোবদ্ধ কবিতা যেন কাব্যসুন্দরীকে অলঙ্কারে আভরণে সাজিয়ে গুছিয়ে এনে হাজির করে। তার সব কিছু বজায় রেখে রূপবৈভব এবং রসসৌরভ আস্বাদন যেন পোশাকি ধরণের। কিন্তু এমন সুন্দরীও আছে যার সাজসজ্জা না থেকেও রূপের আলো পড়ে ঠিকরে, যার আভরণহীন সহজ সৌন্দর্যই মনোরম,—তাকে সাজানো যেন সুন্দরের বন্ধনের নিষ্ঠুরতা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।" ('পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা)।

পদ্যে সহজ কথাটুকু সোজা করে বলা যায় না বলে অনেক সময়ে এই বাঁধন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কানের তৃপ্তি হলেও মনের তৃপ্তি হয় না। অতিরন্ধনের ফলে ব্যঞ্জন যেমন অনেক সময়ে দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে, অতিবন্ধনেও তেমনি কাব্যছন্দ আড়ষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের পারে যেমন রয়েছে এক শান্ত গম্ভীর গভীর রূপ; যেখানে স্রোতের গতি মন্থর, কিন্তু স্তব্ধ

নয়, অন্তরে তার কলোচ্ছ্বাস। তেমনি পদ্যের ঊর্মিমালা পার হয়ে গদ্যকাব্যের স্রোতোবেগ। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'নাটক' কবিতাটির অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ

"পদ্য হোলো সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এলো অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালো মন্দ তার আঙিনায় এলো
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল দোশালা
এলো জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন ঝঙ্কার লাগিয়ে দিল।"

... ...

"বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।"

... ...

"এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।"

জীবনের লগ্নে লগ্নে আমাদের অনুভূতিতে কেবলি সাজানো জিনিস পরিপূর্ণ রূপে আসে না। অনেক টুকরো টুকরো দেখার সামগ্রী মনকে নাড়া দিয়ে যায়। পদ্যছন্দের মধ্য দিয়ে বলতে গেলে তার সহজ রূপটি যেন থাকে না, অথচ ঐ দেখার টুকরো থেকে

সমগ্র দেখার অনুভূতি বা উপলব্ধি আসে অনায়াসেই। তাই রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন গদ্যকবিতার আশ্রয়। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'দেখা' কবিতাটিতে এই কথাই বলেছেন তিনি। সহজ দেখার মধ্য দিয়ে যে সহজ মুহূর্তগুলি ধরা দেয়, সেই উপলব্ধি সহজ ভাষা দিয়েই হৃদয়ের কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া।

"মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাইনে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারু-কাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব কিছু।"

এমনি করেই ছোট ছোট অনুভূতির ব্যাপ্তি ভাষা ও ভাবের ব্যাপকতর গতিছন্দে। ছন্দের বন্ধনে তাকে বেঁধে রাখতে কবির ভরসা হয় নি, কেন না কথার গোলকধাঁধায় পড়ে ..নীরূপ ঘুরে ঘুরে মরবে, কিন্তু মনের মণিকোঠায় পৌঁছাবে না। 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের এক-সংখ্যক কবিতাটিতে এই কথাই বলেছেন তিনি।

"জীবনে নানা সুখ দুঃখের
এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখনো কাছে এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো একটু টুকরো।
গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে
যেন আচমকা কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে।

কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
ভারতীর গলার হারে ;
সাহস করিনি,
ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়।
ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়
পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।”

এমনি করে সত্তর বছরের কোঠায় এসে তৈরী হল গদ্যছন্দ গদ্যকবিতার হল সৃষ্টি। এই গদ্যকবিতার সঙ্গে কবির দেখা ‘কোপাই’ নদীটির ভারি মিল। পদ্মার কূল ছাপানো ভরা-ছন্দ থেকে কোপাইয়ের সাদাসিধে ছন্দের ফল্গুধারায় বিবর্তন।

“কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁঠি আঁঠি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।”

এই তো গেল মোটামুটিভাবে পদ্য থেকে কবিতার গদ্যছন্দে আসর জমানোর কথা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই গদ্যরীতির সঙ্গে গানের আলাপের তুলনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে সায় দিয়ে বলেন, “আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্ম-বিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু

নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।" এমনি করে 'কাব্যকে বেড়া-ভাঙ্গা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা' দিয়ে 'সাহিত্য সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হালকা' করে 'তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা' যেমন এনে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তেমনি গানের ক্ষেত্রেও তাল এবং সুরের দিক থেকে বন্ধন ঘুচিয়ে গানকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীত রচনার ইতিবৃত্ত অনুধাবন করলে পর্বে পর্বে দেখতে পাই যে রাগ-রাগিনীর অনুসরণ থেকে তিনি কথা ও সুরের ভাবসম্মিলনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন, এবং তারও পরে ভাব প্রকাশকেই প্রধান করে সুরকে করেছেন শুধু সাথী। সেখানে ছন্দ যেমন ভাবের ছন্দ, সুরও তেমনি ভাবের সুর। তাঁর গানের মধ্যে তিনি আলাপ অথবা তান বিস্তার বরদাস্ত করেন নি, কিন্তু আলাপের ভঙ্গিতে রচনা করেছেন গানের পর গান। একদা ভাবের জোয়ারে বাঁধা ছন্দের বাঁধ ভেঙ্গে কাব্য নূতন স্রোত এনেছিল বাঙালীর চিন্তাধারায়, তেমনি স্বাতন্ত্র্য দেখা দিল সঙ্গীতেও। 'তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজতে লাগল যা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগ-রাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজীবন সঙ্গীত সাধনায় এই 'হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে' প্রকাশ করবার সুর খুঁজে বেড়িয়েছেন। আদিযুগের ছন্দোবদ্ধ কবিতার থেকে যেমন অন্ত্যযুগের ছন্দছুট কবিতায় তাঁর বিবর্তন, তেমনি দেখি আদিযুগের তালযুক্ত গান থেকে শেষ অধ্যায়ের তালছাড়া গানে তাঁর অভিযান। কাব্যে যেটা ছন্দ, গানে সেটাই তাল। গানের কথার কাঠামো ছন্দোবদ্ধ, এবং কবিতার যতিবিভাগের মতোই গানেরও পর্ববিভাগ,—সুর-তালের খেলায় যেটা সহায়ক। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাব প্রকাশের সাবলীলতার জন্য নূতন নূতন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন, গীতরচনার বেলাতেও তেমনি নূতন নূতন তালের সৃষ্টি

করেছেন। এমনি করেই তাঁর সাতমাত্রা, নয়মাত্রা, এগারো বা আঠারো মাত্রার গান তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ কানে ভালো লাগা এবং মনের মধ্যে পৌঁছানোর উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন বেশি, —তাতে বাঁধা সড়কের বাইরে পদক্ষেপ করতে হলেও কুণ্ঠিত বা নিবৃত্ত হন নি।

'গীতবিতান' গ্রন্থে (২য় সংস্করণ) গান সাজানোর সময়ে 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে,—যাতে, 'সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।' কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এর মধ্যেকার অনেক গানই ঠিকমতো কবিতার ছন্দ বজায় রেখে পড়া যায় না। অথচ যখন সুর সহযোগে গীত হয় তখন ছন্দের এই ছোটখাট ত্রুটি ধরা পড়ে না। নিধুবাবুর টপ্পা গান থেকে শুরু করে অতুলপ্রসাদের গান পর্যন্ত চোখ বুলালে দেখতে পাই অধিকাংশ না হলেও প্রচুর সংখ্যক গানেই কাব্য হিসেবে এই ত্রুটি আছে। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথেই এই ত্রুটি কম। কাব্য এবং গানের এই গরমিলের ভেতরকার কথাটা এই যে কাব্যের ছন্দ গানের তালে যেমন আপন চাল বজায় রাখবার সুবিধা পায়, তেমনি ছন্দোগত ত্রুটিও গানের মাত্রাবিভাগের সামঞ্জস্যে ঢাকা পড়ে যায়। অর্থাৎ গানের বেলায় সুরের সহায়তা মেলে বলে কাব্যছন্দের ততটা গুরুত্ব নেই। সুতরাং একথা ঠিক যে গদ্যছন্দের বেলাতে কাব্যছন্দের সঙ্গে কাব্যগত আঙ্গিক বা চালের যে বিভেদ দেখা যায় সেটা গানের বেলাতে দেখা যায় না। তাহলে গদ্যছন্দের কবিতার চেয়েও গদ্যছন্দের গান সহজতর। সুরের খেলায় কাব্যগত সঙ্গীতের ছন্দ ওঠে সাবলীল হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গান থেকে শুরু করে একেবারে শেষ বয়সের গান পর্যন্ত সঙ্গীতের এই ছন্দোমুক্তির প্রবাহ চলেছে। তাঁর কাব্যরচনার ইতিহাসেও যেমন পরিণত মুক্তছন্দ,

বা গদ্যছন্দের পর্বে আসবার আগেও মাঝে মাঝে হঠাৎ ছন্দছুট কবিতার সাক্ষাৎ মেলে, তেমনি গীতরচনার পরিণত পর্বের পূর্বেও কিছু কিছু গানে গদ্যরীতির চমক দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দী ঢঙের ওস্তাদী গানে যেমন এক পংক্তি বা দু-তিন পংক্তির গানকে সুরে খেলিয়ে ব্যাপ্তি দেবার রীতি, সেই রীতির অনুসরণে (পরিমিত সুরের খেলায়) রবীন্দ্রনাথও প্রথম যুগে গান রচনা করেছেন। যেমন, 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন', 'হরষে জাগো আজি', 'তুমি আপনি জাগাও মোরে', 'নূতন প্রাণ দাও', 'বাজাও তুমি কবি', 'ওই পোহাইল তিমির রাতি', 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' ইত্যাদি। এই সব গানে মিলের বাঁধাবাঁধি নিয়ম কিম্বা ছন্দের নিয়মিত ব্যবহার নেই বলে কবিতা হিসেবে এগুলিকে উঁচু আসন না দিলেও গান হিসেবে এগুলি যে উঁচুস্তরের তা সন্দেহাতীত। সব রকমের কাব্যছন্দের সঙ্গে আবার সব রকমের গানের ছন্দ মেলে না; কিন্তু সঙ্গীতে ঐ সব ছন্দ না থাকলেও কানে যখন শুনতে ভালো লাগে এবং মনে যখন দোলা দেয় তখন নূতন নূতন তালে গানে সুর দিতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হন নি। ছন্দ নিয়ে যেমন তাঁর পরীক্ষার অন্ত নেই, গানের বেলাতেও তেমনি অন্ত নেই নূতনত্বের। 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল' গানটির পংক্তিতে অন্ত্যমিল আছে, কিন্তু সমগ্র গানটি একযোগে গেয়ে তবে আবার ঘুরে আসতে হয়, অন্তরা সঞ্চারী প্রভৃতির হিসেবে ভাগ করে গাইবার রাস্তা নেই। 'নীলাঞ্জন ছায়া' বা 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গান দুটির মধ্যে যে অন্ত্যমিল নেই তা গাইবার সময়ে বোঝাই যায় না। 'হে বিরহী হায়' গানটির চাল গদ্যকাব্যের, কিন্তু সুরের জাদুস্পর্শে তার সেই গদ্য-রূপটা পদ্যময় হয়ে উঠেছে। 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটি দীর্ঘ, ছন্দের মিলও নেই, কিন্তু গাইতে বসে তালে কখনো ফাঁক পড়ে না, সুরে পড়ে না ঘাটতি। 'তবু মনে রেখো' গানটির

অসম পংক্তির জন্যই বোধহয় তার আবেদন মর্মস্পর্শী। মুক্তক ছন্দের কাব্যানুসারী মুক্ত ভঙ্গির গানগুলিও গীতোৎকর্ষ বিচারে সুসম্পূর্ণ এবং স্বচ্ছন্দ। যেমন, 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়', 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে', 'বাণী মোর নাহি', 'আজি দক্ষিণ পবনে', 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে', 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী', 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' ইত্যাদি।

কাজে কাজেই দেখতে পাচ্ছি মূল গানের কাঠামো থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ক্রমে ক্রমে অনেকখানি সরে এসেছে। বাংলা গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান ধ্রুপদাঙ্গের। কথা আর সুর জড়িয়ে এর স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে, এবং রাগ-রাগিনীর সূর্যালোক এতে প্রতিফলিত হয় বলে এই সব গান আঙ্গিকের তারতম্যে, ছন্দ ও তালের সাম্যে-অসাম্যে এবং সুরের-মিশ্রণ বিবর্তনের ফলেও মূল বাংলা গীতরূপ থেকে ভ্রষ্ট হয় না। তারপরে লোকসঙ্গীতের ধারা বেয়ে কীর্তনাদির স্রোত অনুসরণ করে এবং এমন কি বিদেশী সুর চয়ন করেও আবার এক নূতন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এই রূপের চমক দেখা গিয়েছিল সে যুগেও 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কাল-মৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতির গীত রচনা এবং সুর যোজনাতে। আবার তা শেষের দিকে ঘুরে ফিরে দেখা দিল তাঁর ভাবছন্দসমৃদ্ধ গানে, এবং নৃত্যনাট্যে।

কবিতায় ছন্দ এবং গানে তাল একই কাজ করে। তবুও রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দানুসরণে গানে তাল লাগাতে গিয়ে দেখেছেন গরমিল হয়। কিন্তু নিয়মের এই অযথা অনুশাসন তিনি মানেন নি, অথচ তার ফলে যে গানগুলির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি শুধু নূতন তালের ব্যবহারেই বিচিত্র নয়, সব দিক দিয়েই যে অভিনব এবং অনুপম তা 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর', 'বাজিবে, সখি, বাঁশী বাজিবে', 'যে কাঁদনে হিয়া

কাঁদিছে' প্রভৃতি নূতন আঙ্গিকের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। এই থেকে তাহলে মোটামুটিভাবে একটা জিনিস বোঝা গেল যে গানের তালটা কাজে কবিতার ছন্দের মতো হলেও তার চেহারাটা আলাদা। তালের এই নূতন ব্যবহার-পদ্ধতিটা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গেলেই গদ্যকবিতার মতো এমন একটা ক্ষেত্র মিলবে যেখানে কাব্যের ছন্দোমুক্তির মতো সঙ্গীতেরও বন্ধনমুক্তি ঘটতে পারে। তখন 'ভাবের ছন্দের' মতো 'ভাবের তাল' এবং কাব্যরসের মতো গীতরসই তার প্রধান জিনিস হয়ে উঠতে পারে। গদ্যকবিতার ছন্দ সহজে কানে ধরা পড়ে না, কিন্তু গদ্যগানের ছন্দ সুরের নৌকোয় চড়ে একেবারে মনের ঘাটে পৌঁছে যায় অতি সহজেই। সেইজন্যেই বলেছিলাম, গানের বেলায় গদ্য পদ্যের চেয়ে সহজতর না হলেও সরলতর মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ যে একদা 'লিপিকা'র কোনো কোনো অংশে সুর দেবার কথাও ভেবেছিলেন সেটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ তারিখের এক চিঠিতে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো—তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের—কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়,—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি, সমতল অসমতল, প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের—স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন—গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে—তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়—ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা,—তার পরে না-চলারও কত আকার—কত রকমের শোয়া-বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্য রচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের

ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবী কালে সঙ্গীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবচ? মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েচে—ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ—গদ্য তার বয়সের গৌরবে দাবি করবে তার মুক্ত ছন্দ,—ধাত্রীর বদলে প্রেয়সীর প্রতি যদি তার ঝোঁক যায় সেটাকে নিন্দে করতে পারব না।" ('পথে ও পথের প্রান্তে')

শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি গদ্যেও সুর দিয়েছেন তিনি,—খুলে দিয়েছেন গদ্যগানের নূতন সড়ক। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের নিম্নোক্ত অংশ দেখুন; অন্যান্য নৃত্যনাট্যের গানে গদ্যছন্দ রক্ষা করে গেলেও এখানে তিনি পুরোপুরি গদ্যাংশেই সুরারোপ করেছেন।—

"অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।
সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু
তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে
স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের
আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার
হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।"

এই বাক্যাংশের রসটুকু (নৃত্যভঙ্গি ছাড়াও) সুরাভিনয়ের ফলে সহজেই প্রকাশ পেয়েছে, এবং সাঙ্গীতিক বিচারেও এর গীতরসহানি ঘটে নি নিঃসন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের গান পদ্য থেকে চলা শুরু করে গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি এক দেশে কিছুকাল অবস্থিতির পরে এসে পৌঁছেছে গদ্যের 'নতুন দেশে'। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখেছিলেন, "আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না, এমন পণ করিনি।"

শেষ পর্যন্ত তাই করেছেন তিনি। গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি মুক্তক আঙ্গিকে গান তৈরী করতে করতে যখন নৃত্যনাট্যের আসরে নামলেন তখন গীতিনাট্যযুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসমাপ্ত পর্বটা বসলেন চুকিয়ে দিতে! 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে মিল, ছন্দ, তাল ইত্যাদির নানান গরমিল ও ঢঙ শেষে গিয়ে মিশল 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের গদ্যচালে। গানের দিক থেকে বিবর্তনের ধারা দেখুন।—'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের যে অংশ দুটির উল্লেখ নিচে করছি তাতে মিল না থাকলেও ভাষা এবং চাল পদ্যের।—

"আয় লো সজনী, সবে মিলে—
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন—
এ বরষা-দিনে
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।" (কালমৃগয়া)

"মনের মতো কারে খুঁজে মর—
সে কি আছে ভুবনে,
সে তো রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।" (মায়ার খেলা)

কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের নিম্নোদ্ধৃত অংশে কথাবার্তার ভাষার গদ্যানুগ ভঙ্গি লক্ষ্য করুন;—

"রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।

যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝটু,
কর তোরা সব যে যার কাজ।”

ছন্দছুট মিলছুট ধারার অনেক উদাহরণ মেলে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' প্রভৃতি সব নৃত্যনাট্যেরই মধ্যে।

“গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বত শিখরে
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝর কল কল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণ-দম্পতি
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্ন রেখা শ্রেণী
রেখে গেছে ঐ পথ পঙ্ক 'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান।”

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের এই গানটিতে মিল বা কাব্যছন্দ নেই, কিন্তু পড়তে বসে একটা অনাড়ম্বর ছন্দের আভাস পাওয়া যায়, কেননা ধ্বনিগত মিল কাব্যাংশটুকুর মধ্যে ছড়ানো। আর যখন এটি গাওয়া হয় তখন সুর এবং তালের মাধুর্যে ধরাই পড়ে না যে এটি ছন্দোবদ্ধ নয়। সুতরাং বলতে পারি এই ভাবে গান গদ্য ঢঙকে সুর তাল মাত্রার সহায়তায় রসের এমন পর্যায়ে উন্নীত করে যেখানে কাব্যশৈলীর প্রশ্ন অবান্তর মনে হয়। নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে এই সঙ্গে সহায়তা করবার জন্য আছে আবার নাচের ছন্দ। 'পুনশ্চ-নাচের আসরে' নাচের মুদ্রা প্রভৃতি মণ্ডিত নিয়মের নিগড় ভেঙ্গে গিয়েছে। রবীন্দ্র-নৃত্যের মধ্যে ছন্দটাই প্রধান—যে ছন্দ গানের কথা আর সুরের সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত হয়ে একই রসের প্রকাশনায় নিযুক্ত। নাচ এখানে প্রধান নয়, এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে অভিনয়ের অংশটুকুই প্রধান—সে

নৃত্যাভিনয় গানের সঙ্গে যেমন, আবৃত্তির সঙ্গেও তেমনি ছন্দ মিলিয়ে চলে। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের নৃত্যসহযোগে আবৃত্তির অংশ— 'হায় হায়, নারীরে করেছ ব্যর্থ দীর্ঘকাল জীবনে আমার।…', কিংবা 'একী দেখি! এ কে এল মোর দেহে পূর্ব-ইতিহাস হারা!'…, অথবা 'এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ! এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।…' ইত্যাদি অংশ, এবং 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের 'এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে…', 'তোমাদের এ কি ভ্রান্তি কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি…', 'তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ…' প্রভৃতি গানের সুর-রূপ নৃত্যাভিনয়ে মনোরম হয়ে ওঠে এবং বক্তব্য বিষয়টিকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র সুরাভিনয়েও সে কাজ হয় না এমন কথা বলা যাবে না।

"আহা মরি মরি
মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি উন্নত দর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো, সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার
আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি।"

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের এই গীতাংশের মধ্যে কাব্যিক ভাষা আছে কিন্তু কাব্যিক ছন্দ নেই। সুরের বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে গানের মধ্য দিয়েই এই জাতীয় অংশের অভিনয়কুশলতা ফুটে ওঠে, এবং এই অংশের নাচের মধ্যেও সেই একই অভিনয়ভঙ্গির রূপারোপ।

পুরোপুরি মিলহীন গদ্যের ঢঙে গান এবং অভিনয়ের চরম রূপ দেখা যায় 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে। সুর এসে

গদ্যময়তাকে আড়াল করে দেয়, নাচ ফুটিয়ে তোলে ছন্দোময়তা।

"শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা, নিলেন তাঁহার করপুটের কমল কলিকায়।
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই যে নাচে, এই যে নাচে তরঙ্গ তাহার
আমার জীবন জুড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো, কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি!
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্ম জন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল।'

এর মধ্যে যে ছন্দ তা সোজা হৃদয়ে প্রবেশ করে—কোনো জাঁক-জমকের পরোয়া না করে। গদ্যের সোজা রাস্তায় না এলে কি এত সহজে তা জায়গা করে নিতে পারত? আরো দেখুন,—

"এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কূয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও, জল দাও, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ—
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কূয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।"

এই রকম গদ্যগান এর পাতায় পাতায়। অথচ কোথাও মনে হয় না গীতবিচারে কোনো ফাঁক পড়েছে। গদ্য কবিতা যেমন অতি ছোট ছোট কথাকেও কাব্যের পর্যায়ে তুলে ধরে সম্মান দেয়, গদ্যগান তেমনি তাকে তুলে নেয় রসের উৎসমুখে। গদ্যগান ভাষার দিক থেকে যেমন আড়ম্বরশূন্য তেমনি সুরের দিক থেকেও অনাবশ্যক আভরণ ঘুচিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক পাতিয়ে বসে। রাগ-রাগিণীর ছোঁয়াটুকু থাকে তখন তার অন্তর্নিহিত ভাবাবেগের সঙ্গী হিসেবে,—রূপ প্রকাশ করতে নয়, স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে, সঞ্চার করতে রসের মাধুর্য।

"মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গী, খোঁজে ইসারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা করে।"

এই 'বোধের বেগ'ই নিজেকে প্রকাশিত করবার তাগিদে ছন্দ আর অলঙ্কারের মোহ বিস্তার করে, আবার কখনো বা একেবারে নিঃসম্বল বেশে এসে সমর্পণ করে নিজেকে। গদ্যগান সেই সমর্পণের ঋজু ভঙ্গি, নিবেদনের শেষ পর্ব,—যেখানে 'বাণী আপন হারা গানের সুরে।'

ছন্দ থেকে ছন্দোমুক্তির পথে পদ্য থেকে গদ্যে কাব্যরচনা ও গীত যোজনার ধারা নিয়ে আলোচনা হল। এবারে এই সূত্র ধরে বিচার করে দেখা যাক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রাগানুগ ও তালযুক্ত সঙ্গীত থেকে রাগ মিশ্রণ এবং তাল লয়ের বৈচিত্র্য পার হয়ে সুরের ও ছন্দের মুক্তিপর্বে অভিযানের প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতরচনার প্রথম পর্বের গানে যে সব সুর দিয়েছেন এবং যে সব তাল ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ মার্গসঙ্গীতানুগ। সুর তালের সেই নানাবিধ ব্যবহার থেকেই সূত্রপাত বৈচিত্র্যের। রাগ-রাগিণীর রূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়েই হল অন্তর্নিহিত স্বরূপের উদ্ঘাটন। প্রথম পদক্ষেপে যখন কথার চেয়ে সুরেরই খেলা বা প্রাধান্য বেশি, তখন শুরু হল কথা দিয়ে এই সুরের রসকে ধরবার পালা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমাদের গুণীরা ভৈঁরোতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়! কিছুমাত্র না। তবে ভৈঁরোকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিনী বলিবার কি মানে হইল! তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সঙ্গীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সঙ্গীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"আমাদের দেশের সঙ্গীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভাল লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, অর্ধরাত্রি ও বর্ষা, বসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কিনা জানি না। অন্তত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে-কালে ঋতুতে-ঋতুতে নব নব রাগিনী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে-একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।"

('অন্তরবাহির,—পথের সঞ্চয়')

বাইরের প্রকাশের অন্তরালের এই গভীর রসবৈচিত্র্যকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুতোয় কথা আর সুরের মালায় গেঁথেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের রাগকেন্দ্রিক গানের সুরের মধ্যে রাগ-রাগিণীর এই ভাব-মাধুর্য বিধৃত, কিন্তু গানের কথায় সেই ভাব সর্বদা ব্যঞ্জিত হয় নি। যেমন কানাড়া ভৈরবী বেহাগ প্রভৃতি রাগের ভিত্তিতে রচিত তালযুক্ত গান 'আমার পরাণ লয়ে কী খেলা খেলাবে', 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু', 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে', 'সদা থাকো আনন্দে' প্রভৃতির সুর আর কথা সমান তালে চলে না। অর্থাৎ সুর ব্যতিরেকে সুরাশ্রয়ী সেই সেই ভাব এগুলির কাব্যরূপে ফুটে উঠবে না। কিন্তু এই সঙ্গে যদি তুলনা করি 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে', 'ওলো সই, ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই', 'বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে', 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে', 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' প্রভৃতি গানের, তাহলে দেখি এগুলিও বেহাগ বিভাস ভৈরবী কানাড়া প্রভৃতি সুরভিত্তিক তালযুক্ত গান হয়েও কথাকে পাশ কাটিয়ে যায় নি। অর্থাৎ সুর ব্যতিরেকেও এ গানগুলির শুধু কাব্য-মূল্যই নয়, একটা সুর-সাযুজ্যও অনুভব করা যায়। এই থেকেই সুর-মিশ্রণের তাগিদ, সুর-মিশ্রণের সূত্রপাত। গানের ভিতরকার ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই তিনি রাগ-রাগিণীর বাঁধা চালের মধ্যে ব্যতিক্রম এনেছেন; সকালবেলার রূপ ফোটাতে গিয়ে হয়তো ললিত বা ভৈরবীর বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় নি, কথার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য স্বরগ্রামে—এমন কি সুরের মধ্যেই পরিবর্তন এনেছেন। এই ভাবে গানের কাব্যরূপ বা সুররূপকে ছাপিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীতের সমগ্ররূপ। প্রকৃতি পর্যায়ের গানে রূপ সৃষ্টি বা মূর্তিকল্পনা যেখানে প্রধান সেখানে রূপকে ছাপিয়ে রাগিণীকে বড় করেন নি। এমনি

ভাবে প্রকৃতির রাগরূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলেছে প্রকৃতির কাব্যরূপ। যখন একটি গানে বর্ষার রূপ ফোটাতে চাই তখন শুধুমাত্র মল্লার রাগে তার সবটুকু প্রকাশ পায় না; বর্ষার রূপ নানা রকমের, নানা ধরনের বিচিত্র অনুভূতির রসে সমৃদ্ধ যে-বর্ষা তার কাব্যিক প্রকাশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে মল্লারের সঙ্গে মিশাতে হবে অন্য একটা রাগ। তেমনি সকালের সমগ্র রূপটিকে মূর্ত করতে হলে টৌড়ি বা ভৈরবীর সঙ্গে আরো কিছু মিশাবার প্রয়োজন। এমনি করেই রচিত হয়েছে ইমন সুরে বর্ষার গান 'রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা'; মূলতানের সঙ্গে পিলুর মিশ্রণে পেয়েছি 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান'; কেদারা রাগের "তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে' গানটির মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে বাউলের সুর। আর তালের বাঁধন-ছাড়া গান হিসেবে পেয়েছি 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না', 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে' প্রভৃতি। নমুনা মিলবে অজস্র, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৃহত্তর অংশটাই এই ধাঁচের।

এই ভাবে পুরো গানের চালটাই যখন প্রধান হয়ে উঠল তখন বাণীরূপ বেরিয়ে এল ছন্দমিলের খোলস ছাড়িয়ে ভাবের প্রাঙ্গণে। তখন কাব্যছন্দেরও যেমন আর প্রয়োজন রইল না, তেমনি রাগবন্ধ বা তালানুষঙ্গেরও প্রয়োজন রইল না। সঙ্গীত মুক্তি পেল রসের খোলা সড়কে। তারপরে ছন্দবিবর্তন, তালবিবর্তন প্রভৃতি বহিরঙ্গের বালাই ঘুচিয়ে এসে হাজির হল গদ্যগানের আসরে। তখন কখনো বা রাগ-রাগিণীর রেশটুকুমাত্র নিয়ে, কখনো বা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণের ফলে, আবার কখনো বা লোকগাথার চালে বিচিত্র রূপে বিচিত্র আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করল রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।

এই ভাবে গদ্যছন্দের সঙ্গে এল গদ্যগান, এল রাগ-তাল-বন্ধনহীন ভাবছন্দোবদ্ধ সাদামাটা সুর। এই সুর চলেছে পালতোলা নৌকোর মতো সরল গতিতে, তার সঙ্গে রাগ-রাগিণীর গুণটানা বা তাল

মানের লগিঠেলা কখনো-সখনো চলে তো চলুক, লক্ষ্য শুধু গানের স্রোতে ভেসে রসের খেঁয়া পারাপার করা। গদ্যছন্দের ডিঙি বেয়ে পাড়ি জমানো যেমন পদ্যছন্দের নৌকোর হাল ধরে এগোনোর চেয়ে কঠিন বলে বর্ণনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি রাগ-রাগিণীর এবং তালের অনুশাসন এড়িয়ে গদ্যগানের ভেলা ভাসানোও কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। চারদিকের নানান মিশ্র তান, দেশী-বিদেশী সুর, লৌকিক ঢঙ আর কালোয়াতী কায়দার ঢেউ এসে পড়ে। তার মাঝে চলতে হয় ঠিক মেজাজটি বজায় রেখে। যেমন, 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে' গানটিতে মিলটা ছুঁই ছুঁই করেও এড়িয়ে গিয়েছে, আর সুরও তেমনি চলেছে আড়াআড়ি করে; 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী' অথবা 'আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে' প্রভৃতি গানের বেলাতেও সুরের ঐ একই ধারা। এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে যে সব নিছক গদ্য বা গদ্যছন্দের রচনায় সুর লাগাতে দেখি তাতেও সুরের ঐ একই খেলা। অর্থাৎ সঙ্গীত এখানে এমন সব সুর খুঁজেছে যে সুর 'হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগ-রাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়।' কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন পদ্যছন্দ থেকে গদ্যছন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ, তেমনি যাত্রা পদ্যগান থেকে গদ্যগানে, এবং আবার তাঁর অভিযান রাগানুগ সুর থেকে রাগাতীগ সুরের অভিনবত্বে, যার সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এটিও আমাদের ভারতীয় সুর পদ্ধতিরই এক বিশিষ্ট রূপ, সবিশেষ বিবর্তন। আর এই হল সঙ্গীতের প্রকৃত মুক্ত রূপ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রুচির প্রসঙ্গ

গীতপরিবেশনে তিনিই সার্থক যাঁর কণ্ঠে গানের কথা আর সুর ছাপিয়ে অনির্বচনীয় এক আবেগ ফুটে ওঠে, শ্রোতার মন মাতিয়ে দেয়, শ্রোতাকে নিয়ে যায় বস্তুর অতীত এক অনুভূতির জগতে। এই বিশুদ্ধ আবেগ শিল্পীর কণ্ঠ থেকে তখনই উৎসারিত হয় যখন রুচিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে রুচিপূর্ণ সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করেন। গানের এই আবেগ-রসকেই বলব গীতরুচি। গান যদি এই রুচির দীপ্তিতে উজ্জ্বল না হয়ে ওঠে তবে গাইয়ের গলা মিঠে হলেও এবং সুর তাল উচ্চারণ নির্ভুল হলেও সে গান মন-মাতানো হয় না। এ জিনিস গানের সুরের উপরে ভাবের কারিকুরি নয়, সুরের সঙ্গে ভাবের মিলনমাধুর্য।

গীতরুচি বলতে কী বোঝাতে চাই সে-প্রসঙ্গে আসবার আগে রুচি কাকে বলে তা একটু তলিয়ে দেখা যাক। যুগের পরে যুগ ধরে আমাদের জীবনধারার মধ্য দিয়ে জীবনের যে মূল্যবোধ এবং সৌন্দর্যজ্ঞান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, এবং আমাদের ধরন-ধারণ আচার-আচরণে প্রকাশিত হয়ে জাতীয় বিশেষত্বের আভাস দিচ্ছে, এক কথায় তাকেই বলি রুচি। রুচি এমন একটা বোধ যা দিয়ে আমরা ব্যক্তিগত ভালমন্দের বিচার করতে পারি, এবং পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক ভালমন্দেরও একটা পরিবেশ গড়ে তুলি। অর্থাৎ আমাদের আপন আপন সত্তা এবং সামাজিক অস্তিত্ব নির্ভর করে এই রুচির উপরে। রুচির মাপেই ব্যষ্টির বিচার, ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

সঙ্গীতের রুচিও তেমনি গানের সেই গুণ যার স্পর্শে গান শুধু অপরূপই হয় না, হয়ে ওঠে জীবনেরই প্রতিরূপ, জীবন-রসের প্রতিফলন। রুচি ঔজ্জ্বল্য দান করে,—তা সে ব্যক্তিকেই হোক বা

সমাজকেই হোক। সঙ্গীত সেই স্বতোৎসারিত উজ্জ্বলতা। বাংলা গান যেহেতু ব্যক্তিক অনুভূতির প্রকাশ, এবং ব্যক্তিক অনুভূতি যেহেতু সামাজিক পরিবেশ নির্ভর, সে হেতু গানের সামাজিক মূল্য সম্পর্কে সচেতন না হলে চলবে না। আজকাল গানের সৎরুচি দুর্লভ হয়ে উঠেছে, গানের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে শুধু ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত সুখ, ইচ্ছে, চাওয়া-পাওয়া। অথচ সঙ্গীতই আমাদের হৃদয়বৃত্তির সার, জীবনের লাবণ্য। আমাদের দিনগত সব কাজের মধ্যে সঙ্গীতের ছোঁয়া মনটাকে এমন একটা সুরে বেঁধে রাখে যাতে কাজের গ্লানির দিকটা মনকে স্পর্শ করে না। 'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি,—"আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়—তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরাম-ব্যারাম টুকিটাকি খুটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলেছে. কিন্তু সঙ্গীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্স্পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে।"

গীতরুচি মোটামুটি ভাবে রচনার উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। তবু খাঁটি সৃষ্টি হলেই সৃষ্টির খাঁটিত্ব রক্ষা হয় না। গীত পরিবেষণের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ। কতক শ্রেণীর গান আছে যা যেখানে সেখানে যখন তখন গাওয়া চলে না, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে গানের রুচির মিল হয় না। আবার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় থাকলেও কোনো কোনো গান গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রাণহীন ভাবে, পরিপূর্ণ রুচিবোধের অভাবই যার কারণ। একথা ঠিক যে কবিতা

বা গান, গল্প বা কাহিনীর মতো করে বোঝবার জিনিস নয়, এর আড়ালে কিছুটা না-বলা কথা, কিছুটা রহস্য থেকে যাবেই। শিল্প কর্ম সব সময়েই সমষ্টির মধ্যে আবদ্ধ থাকে, একেকটা বিষয়ের একেক রকম সমঝদার। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কতকগুলি রুচি তৈরি হয়ে যায়। আমরা বুঝিতে পারি কোনটা সুরুচিপূর্ণ কোনটা কুরুচির পরিচায়ক। আমাদের চালচলন, চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা, কাজকর্ম সব কিছুই সেই বিশেষ রুচির বাহন হয়ে আমাদের স্বরূপ প্রকাশ করে। কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলতে যে ব্যাপকতার উপলব্ধি হয় তা আমাদের রুচিরই সামগ্রিক রূপ। আমাদের প্রবণতার মধ্য দিয়েই আমাদের সত্তার প্রকাশ। একই লোকের মধ্যে যেমন হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি সব ভাবই প্রকাশ পায়, অথচ সামগ্রিক ভাবে আমরা বলতে পারি লোকটা রাগী বা হিংসুটে, ভাল বা মন্দ, তেমনি একই সমাজ বা একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন রুচির ধারা বা কৃষ্টির ঘাত-প্রতিঘাত থাকলেও সমগ্রভাবে তার একটা সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে তেমনি আমরা পাই রাবীন্দ্রিক রুচির পরিচয় এবং রাবীন্দ্রিক রুচি বাংলা দেশের ও ভারতীয় ঐতিহ্যের একেবারে অঙ্গাঙ্গী পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে সেই পরিচয়েরই স্বাক্ষর। কেমন ভাবে, তা একটু মিলিয়ে দেখা যাক। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে প্রথম কথা, এর ভিত্তি রাগানুগ। অর্থাৎ ভারতীয় রাগ-রাগিণীর যে রূপ এবং প্রকাশের যে কল্পনা, রবীন্দ্র-সঙ্গীত তারই ধারানুসারী। দ্বিতীয়ত, রাগানুগ হলেও এ গান গতানুগতিক পদ্ধতির নয়। রাগ-রাগিণীর মিশ্রণের মধ্যে যে আধুনিক ভঙ্গি সেটাও এলোমেলো নয়, সূক্ষ্ম সাঙ্গীতিক বোধই যেমন তার ভিত্তি তেমনি আত্মিক অনুভূতি এর মর্মরস। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কাব্যরূপ এবং সুররূপ। কথার মধ্যেকার

কবিত্ব এবং গীতাংশের সুরমাধুর্য পরস্পর সম্পৃক্ত। সুতরাং এ দুয়ের সামঞ্জস্যে গায়ক এবং শ্রোতা তাদের মনকেই প্রতিফলিত হতে দেখে। চতুর্থ বিশেষত্ব, এ গানের বাঙালীয়ানা। বাংলার জল মাটি, আকাশ-বাতাস আর বাঙালীর কল্পনা-মনন এই সঙ্গীতে মিশিয়ে আছে। পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্র-মানসের শেষ কথা। ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথের মানসে ভারতীয় মানসই প্রতিধ্বনিত।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেষণ করতে গিয়ে রাবীন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করাতেই সার্থকতা। আন্তর অনুভূতি দিয়ে এবং নিয়মিত চর্চা করে নিজেকে রাবীন্দ্রিক পরিবেশভুক্ত এবং রাবীন্দ্রিক রুচির সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হয়। বাংলাদেশে জন্মেছি, তাই এর বারো আনা সংস্কৃতি স্বভাবতই আমাদের জন্মগত। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে তার চর্চা এবং পরিচর্যা না করলে সেই জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হতে হবে আমাদের। মানুষ জন্ম নেয় নির্দিষ্ট কৃষ্টির আওতায়। সেই আওতার মধ্যে থেকে থেকে আপনা থেকেই একটা রুচিবোধ গড়ে ওঠে। সেই রুচি কোন খাতে বইবে, কোন পথ নেবে আমাদের জীবনে, তা স্থির হয় আমাদের ইচ্ছা বা ক্ষমতা অনুযায়ী। এই ইচ্ছা বা ক্ষমতা আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন থেকে বিযুক্ত নয়। পারিবারিক গণ্ডি, বন্ধুবান্ধব, সঙ্গীসাথী, শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়, পাড়া প্রতিবেশী ইত্যাদি সমন্বিত সামাজিক পরিবেশের উপরে তা নির্ভর করে। মন যদি বিশেষভাবে অনুভূতিপ্রবণ না হয় এবং যদি বিশেষভাবে চেষ্টা না করা যায় তবে সুসঙ্গত রুচি গড়ে ওঠে না। এমনকি, রুচিবোধটাই ভোঁতা হয়ে যায়, ভাল মন্দ বিচারের বোধ থাকে না। জীবনের সব কিছুর মতো রুচিও অনুশীলনের সামগ্রী। জীবনটাই অনুশীলনের।

এক কথায় তাহলে বলা যায়, রাবীন্দ্রিক রুচি গঠনের জন্য আমাদের যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন দরকার, তেমনি দরকার দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক পরিবেশ—এ

দুয়ের অনুশীলন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তথা রবীন্দ্ররুচির মূল আধার ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় জীবনদর্শন। রাগ-রাগিণীর মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির এবং বিশ্বানুভূতির যেমন প্রকাশ, তেমনি কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ভাবরূপের এবং রসরূপের। কোনো বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে এগোতে হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গীতাংশ আয়ত্ত করবার পরও গীতরুচির পরিপূর্ণ বিকাশ অনুশীলন নির্ভর। ব্যবহারিক জীবনে আইনজ্ঞ হয়তো ছোট-খাট ওষুধ নিয়ে ডাক্তারী করতে পারেন, ডাক্তার আবার বৈদ্যুতিক কাজকর্মে হাত লাগাতে পারেন, জানতে পারেন আর দু-চারটে বিদ্যাও, কিন্তু মূলত তাঁরা উকীল এবং ডাক্তার। উকীল যদি ডাক্তারী করতে চান তবে তাঁকে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পাঠ নিতে হবে। তেমনি গানের বেলাতেও অন্য শ্রেণীর কোনো গাইয়ে বাজিয়ে যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকেও এই সঙ্গীতের বিশেষ পাঠ নিয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে তাঁর রুচিকেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুকূল করে নিতে হবে নিশ্চয়। একথা অবশ্যই স্বাকার্য যে বাংলা গান,—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান সাহিত্যাশ্রয়ী। এর সুরশিল্পের দিক যেমন প্রণিধানযোগ্য, সাহিত্যের দিকও তেমনি অনুপেক্ষণীয়। তাই কেবলমাত্র গান গাইতে শেখাটাই শেষ কথা নয়, গানকে কেন্দ্র করে গানের ভাবরূপ বা সাহিত্যরূপ উপলব্ধি করতে হবে। সাহিত্য যেমন সমগ্র জীবনের আলেখ্য, সঙ্গীতেও তেমনি জীবনেরই প্রতিফলন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতজ্ঞ রসিকের কাছে আমরা জীবনের উপলব্ধি সঞ্জাত এই বিশিষ্ট রুচির দাবি করতে পারি।

আজকের দিনে কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখা কর্তব্য, কেননা সস্তা মোহ আর সাময়িক উচ্ছ্বাস গানের গগন ছেয়ে ফেলছে। বাংলা গানের বাজারে নিয়ম করে লেগে থেকে কেউ গান শিখতে চান না,—আর পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে গানও একটা।

কিন্তু গানকে পেশা করতে হলে গানকে সব বিষয়ের আগে স্থান দিতে হয়, সন্দেহ কী। গীতশিল্প, চিত্রশিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির মতো সুকুমার শিল্পকলা পৃথিবীর আর পাঁচটা পেশার মতো কর্তব্যমাত্র নয়, এর সঙ্গে রয়েছে মনের যোগ; শুধুমাত্র জীবন ধারণের অনুষঙ্গ নয়, জীবনরসের অভিব্যক্তি। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে তারপরে গানকে পেশা হিসেবে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কলকাতা শহরে, বা অন্যত্র, যে কয়টি সপ্তাহান্তিক সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র আছে তাদের পাঠক্রম পূর্ণাঙ্গ না হলেও নিয়মিত ভাবে অনুধাবন করলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বেশ কিছুটা ব্যুৎপত্তিলাভ হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করে গানের ফাটকা বাজারে সবাই অংশীদার হতে চান বলে গান প্রাণহীন হয়ে পড়ে, গায়কের গীতজীবনেরও সংক্ষিপ্ত অবসান ঘটে। এবং গায়কের সঙ্গে সঙ্গে গানটাকেই লোকে দুর্বল বলে ভেবে বসে। তার প্রমাণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানারূপ অপবাদ। পরিণামে শুধু ব্যক্তিরই নয়, সমাজেরও ক্ষতি হয়। রুচির বিকার ঘটে।

যেমন হতে চলেছে আজ বাংলা গানের ক্ষেত্রে। শুধু গানই নয়, এখনকার সিনেমা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই রুচিগত শালীনতার অভাব দেখা যাচ্ছে। জনরুচি নিম্নগামী: কিন্তু ভরসা করব যাঁদের উপরে সেইসব পরিবেশকদের কাছেও বাজারের চাহিদাই মানদণ্ড। রুচি-বিচারই যে শিল্পের প্রাণ তা কেউ ভেবে দেখেন না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে আর পাঁচটা বাজিমাৎ করা গানের যদিও তুলনা হয় না, তবু এর মধ্যেও নানান রসের মিশাল দেবার চেষ্টা চলছে দেখতে পাই,—নানান উত্তেজক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা; হয়তো গানের মধ্যেকার মূল ভাবটুকু যন্ত্রের কোলাহলে কিংবা পরিবেষণের বিকৃতিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজের নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল করে নিয়ে অথবা সাময়িক বাহবা

কুড়াবার জন্য সস্তা চটক দিয়ে গাইবার চেষ্টা হচ্ছে এবং এ গানের মধ্যে এটা নেই, ওটা নেই, এটা থাকা উচিত ছিল, ওটা রাখা ঠিক হয় নি,—এই ধরনের চিন্তা ও আলোচনা দেখা দিচ্ছে। আসলে, কোনো সৃষ্টিকর্মেই মন পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তিলাভ করে না। মানুষ পূর্ণতার কাছাকাছিই পৌঁছুতে পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গীতরসে, ভাব সমারোহে এবং সুরের অর্ঘ্যে সেই পূর্ণতারই প্রতিরূপ। আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সব জিনিসের চাহিদা সেগুলি আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে পরিবর্তন লাভ করে, ধারাবাহিক উন্নতির পর্যায়ে ওঠে। কিন্তু শিল্পকৃতির অদল-বদল হয় না, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মতো সুমিত শিল্পের। কিন্তু এই শিল্প নিয়ে যাঁরা বাণিজ্য করেন, তাঁরা স্বভাবতই কথাটা ভুলে যান। রবীন্দ্রকৃতির উপরে ছেনি বাটালি চালিয়ে র‍্যাঁদা বুলিয়ে একে উন্নততর মসৃণতর করবার কথা ভাবেন। কেবলমাত্র ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই যদি সাংস্কৃতিক জগৎকেও পরিচালিত করে তবে রুচির বিকার দেখা দেবেই। জনতার হাতে পড়ে রুচি লাঞ্ছিত হয়, সংস্কৃতি হয় বিপন্ন। যুগে যুগে এমনি হয়ে এসেছে। চর্যাগীতি থেকে শুরু করে গীতগোবিন্দ পর্যন্ত রুচির যে শালীনতা দেখা যায়, তারই আবার একটা বিপরীত তরঙ্গ দেখেছি তদানীন্তন নানাবিধ গীত ও কাব্য রচনায়। বৈষ্ণব কবিদের কীর্তন ও পদাবলীর পরেই মুসলমান যুগে এসেছে অনিশ্চিতি। একদিকে মার্গসঙ্গীতের মাধুর্য এবং অপরদিকে সমাজক্ষয়ী লাস্যলীলা। ফলে গানের জগতে এল খেউড়, আখড়াই প্রভৃতির বেনোজল। পরিশেষে ইংরাজ অভ্যুদয়ের ফলে নানান কৃষ্টির সংঘাতে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতে এল অস্থিরতা। এই বিপন্নতার মধ্যে যুগে যুগে যে সব গুণী, জ্ঞানী এবং শিল্পী চিত্ত স্থির রেখে হাল ধরলেন রুচি-তরণীর, তাদের মধ্য দিয়ে দেশের শাশ্বত বাণী-তরঙ্গ প্রবাহিত হল। কিন্তু

এখনকার যুগে চলছে পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাতের একটা টলমল অবস্থা। সেই জন্যই প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণের, আত্মপ্রতিষ্ঠার। সেই প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপের ভূমি হল রুচি-চর্চা। রুচিকে আমরা বলতে পারি প্রকাশভঙ্গির লাবণ্য। কেনাবেচার কর্কশতা তাকে ম্লান করে। সুতরাং রুচিবান যিনি তিনি স্বভাবতই সাধারণ দর-কষাকষির ঊর্ধ্বে থেকে শিল্প ও কৃষ্টির মর্যাদা রক্ষা করেন। আমরা যদি নিজ নিজ স্বার্থ বা ব্যক্তিগত লাভটাকেই বড় করে না দেখি তবে সমগ্রভাবে সকলের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়, স্বকীয় উন্নতির রাস্তাও আপনা থেকেই পাকা হয়।

কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত নয়, সাধারণভাবে বাংলা গানের প্রসঙ্গেও এই কথাই খাটে। গীতকার এবং সুরকারের সমবেত চেষ্টায় রুচি-নির্মাণ এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের কাজ হতে পারে। এর সঙ্গে গাইয়ের প্রচেষ্টাও অবশ্যই সংযুক্ত থাকবে। কারণ গানের বেলায় রুচিরক্ষার দায়িত্ব ভাগাভাগি হয়ে যায়। যিনি গান লেখেন আর যিনি সুর দেন তাঁদের মধ্যে রুচিগত মিল এবং রসোপলব্ধির সমতা থাকা দরকার। তারপরে আছেন যিনি গান গাইবেন। গাইয়ের মারফতেই শ্রোতা সমগ্র রস একযোগে আস্বাদন করবেন। সুতরাং রুচি রক্ষার দায়-দায়িত্ব তাঁর বেশী ছাড়া কম নয়। আমাদের দেশের সাধক গায়ক সম্প্রদায় বরাবর নিজেরাই এই তিন কাজ একসঙ্গে করে এসেছেন বলে রুচি এবং সংস্কৃতির সমৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া আর কারো মধ্যে এই তিন প্রতিভার একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। এখন একটি পূর্ণাঙ্গ গানের রচয়িতা তিন বা ততোধিক ব্যক্তি। তাই সেকালের চেয়ে একালে গীত-পরিবেশকের উপরেই গীতরুচি রক্ষার ভার এসে পড়ে বেশী মাত্রায়। মনে হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে বাংলা গানের জগৎ পরিচালিত হতে পারে।

অনুকরণ নয়, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুসরণ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে মানুষের ছোটখাট আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা জগৎ থেকে শুরু করে আকাশ বাতাস চরাচর ব্যাপ্ত সমগ্র বিশ্বজগৎ রূপায়িত হয়েছে। মনকেও তেমনি উদার, ব্যাপ্ত, অনুভূতিময় না করে নিতে পারলে প্রকাশমাধুরী পূর্ণতায় পৌঁছুবে কেমন করে? রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য পাঠ এবং তাঁর জীবনদর্শনের উপলব্ধি এক্ষেত্রে অপরিহার্য, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠবে যথাযথ।

এতক্ষণ যে কথা বলা হল তা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সাংস্কৃতিক জগতের কথা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে আমরা যদি বাংলার প্রাণের স্পন্দন বলে স্বীকার করে নিই তাহলে কথা ওঠে পল্লীঅঞ্চলে তবে কি হবে। দেশের সর্বসাধারণ সঙ্গীতের বিশেষ শিক্ষালাভ করবেই বা কোথায় এবং কখন। এভাবে শিখে-পড়ে গান করা তো গোষ্ঠীগত ব্যাপার।

কথাটা ঠিক। আসলে ব্যক্তির গান থেকেই ব্যষ্টির এবং গোষ্ঠীর গান থেকেই সমষ্টির শিক্ষালাভ হয়। নির্ভুল গান শুনতে শুনতে কানও ঠিক হয়ে যায়। প্রাণে যদি স্পন্দন তোলে তবে সে স্পন্দন কণ্ঠেও বেজে ওঠে। নাগরিক সভ্যতায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবার যত উপকরণ শহরে ছড়ানো গ্রামাঞ্চলে ততটা নেই। তবু নগরের ঢেউ সেখানে গিয়ে লাগে এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ঢেউ তোলে। আজকাল সিনেমা, রেডিয়ো, রেকর্ড প্রভৃতির কল্যাণে এই তরঙ্গ আরো ব্যাপক হয়েছে। এখন তো গ্রামগুলিকেও শহর বানিয়ে তোলাই বাণিজ্যিক সভ্যতার লক্ষ্য।

তবে ভরসা এই যে রুচি বা কৃষ্টির গোড়ার জিনিসটা প্রকৃতিগত। তা নইলে বলতে হয় এটা সর্বতোভাবে ধার করা, বই পড়ে কিংবা অন্য দেশের কৃষ্টিসংযোগে গড়ে তোলা কৃত্রিম সামগ্রী। অবশ্য দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ্য করতে হয় যে আমাদের অধিকাংশ সমস্যা বা প্রশ্নই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিয়ে। রুচির দ্বন্দ্ব দোলায়

আর চিত্তের অস্থিরতায় দুলছে আজকালকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়। তাদেরই হাতে ওষুধ, তাদেরই হাতে বিষ। তাদেরই হাতে রুচিরক্ষার ভার, তাদেরই হাতে রুচির বিনষ্টি। অথচ একথা সত্য যে রুচি বা সংস্কৃতির ভিত্তি আমাদের মনে। সে মন শুধু নাগরিক মন নয়। সে মন সর্বাংশেই দেশের মন। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের ধৃতি সম্পর্কে ভাবনার কিছু আছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ শহরের পাঁচ-মিশেলি কোলাহলে এবং হুজুগের মধ্যেই সেই মনটা ঘোলাটে হয়ে উঠবার সম্ভাবনা বেশি। আর সেই ধাক্কাটাই দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বার ভয়।

সেই জন্যই বলেছি, সমগ্র পরিবেশটা অনুকূল হওয়া দরকার। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বৃহত্তর সঙ্গীতেরই অংশ। সুতরাং সমগ্র সঙ্গীত জগতেরই রুচি বজায় রাখতে হবে। যাঁরা গান করেন তাঁরা যদি নিপুণ ভাবে গীতরস পরিবেশন করতে পারেন তবে শ্রোতা এবং শিক্ষার্থী সকলেই লাভবান হতে পারে। রেডিয়ো, রেকর্ড, সিনেমা এবং সাময়িক পত্রিকা মারফত এই প্রসারের কাজ চলে বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষভাবে দায়িত্বসম্পন্ন হওয়া দরকার। দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবান সমাজ গড়ে তোলবার স্বপ্নও এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের থাকা উচিত। এঁরা যদি ভুলে যান যে একাজের আর কটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে তবে দেশের লোক আর আশা করবে কার কাছে? যদিবা এই সবের মূলে অর্থোপার্জনও অন্যতম লক্ষ্য হয়, তবুও আর পাঁচটা সাধারণ ব্যবসায়ীর থেকে তাঁরা যে স্বতন্ত্র সে কথা ভুলে থাকলে চলবে কেমন করে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কি তন্তুবায় সংস্থার তুলনা চলতে পারে? বইয়ের দোকানের সঙ্গে মুদীখানার? আমরা সিনেমার প্রয়োজনীয়তা জাহির করবার জন্য এর জনশিক্ষার দিক নিয়ে বাগাড়ম্বর করে থাকি, কিন্তু কার্যকালে সে কথা ভুলে যাই। তখন Mass appeal বা গণ-আবেদনের কথা বলি। অথচ এই গণ-আবেদন জিনিসটা যে

সঙ্ঘবদ্ধ বিবেচনাপূর্ণ কোনো দাবি নয় সেকথা মনে থাকে না। বরঞ্চ এটাকে স্বার্থসিদ্ধির একটা কায়দা বলেই মনে হয়। আমাদের মধ্যে বন্যার্ত্ত বা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করবার জন্যও সস্তা নাচের আসর বসিয়ে টাকা তুলতে হয়। নানান উপায়ে জনসাধারণের সস্তা ভাল-লাগাকে মূলধন করে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন বা আদায় করা যায়। এই ছিদ্র দিয়ে আমরা নিজেরাই বিকৃত রুচির আবেদন সৃষ্টি করি। অথচ এটা ভেবে দেখি না যে ব্যক্তিগতভাবে আমরা যাই করি না কেন, সেটাকে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরতে গেলেই বৃহত্তর দায়িত্ব এসে যায়। যখন আমরা নিজ নিজ সৃষ্টিকে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরি তখন সেটা আমার ব্যক্তিগত খেয়াল অনুযায়ী না করে সকলের কাছে মেলে ধরবার মতো করে তৈরি করি। আমি দিয়ে তৃপ্তি পেতে চাই। এই তৃপ্তির পথটাই খাঁটি। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে তৃপ্ত হলে তবেই আমি পুরস্কৃত হলাম। তাই গীতস্রষ্টার সঙ্গে গায়ক সুরসৃষ্টিতে একাত্ম অনুভূতিময় হয়ে গেলেই গীতরুচির পূর্ণ বিকাশ, পরিপূর্ণ সার্থকতা।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক বাংলা গান

সাহিত্য প্রসঙ্গে নানারকম সমালোচনা আর মতবাদ। প্রধান বিরোধ,—সাহিত্য বাস্তবের ছবি আঁকবে না কল্পনার তুলি বুলাবে। এই দুই মেরু প্রদেশের মাঝখানে তবু সাহিত্য শাশ্বত। অর্থাৎ, আসলে এ দুটোকেই সে মেনে চলে; বাস্তবকে মেনে নিয়ে যেমন শুধু বস্তুতন্ত্রেরই পূজো করে না,—করে না শুধু দৈনন্দিন জীবনের রেখা-চিত্রণ, তেমনি কল্পনার রথ চালিয়ে অসীম অনন্তে উধাও হয়েও যায় না। সাহিত্যের ভিত্তি বস্তি-জীবনই হোক বা বস্তু নিরপেক্ষ জীবনেই হোক তার মধ্যে বিশেষ কোনো একটা জীবনদর্শন উঁকি মারবেই। সে দর্শন লেখকের। লেখক সমাজেরই একজন, দেশের দশের অন্যতম। সুতরাং তাঁর অনুভূতিশীল মনের পর্দায় যে ছায়াছবির খেলা তা বাস্তবেরই অনুগামী। তার মধ্যে যে কল্পনার রং সেটা তাঁর জীবনদর্শনের বোধসঞ্জাত। তাই তা ইঙ্গিতময়।

কিন্তু কবির বেলায় এই ইঙ্গিত সাধারণের কাছে ধোঁয়াটে বলে মনে হয়। কবির সুনাম বা দুর্নাম এই যে সে আবেগময়। নিজের মনের আবেগ লিপিবদ্ধ বা প্রচার করাতেই তাঁর ঝোঁক। তাই কবি সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আরো বেশি ·রে আত্মগত। গল্পস্রষ্টাদের মতো নানান কথার সুতোয় জাল বুনবার সুবিধে তাঁর নেই। প্রবন্ধকারের মতো নানান যুক্তি আর ব্যাখ্যার অবতারণায় স্ব-মত প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগও তাঁর নেই। কবির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, সীমান্ত বিস্তৃত। কথাশিল্পীরা সমাজের দেহের কথা বলেন, মনের আভাস দেন। কবিরা সমাজের মনের কথা বলেন, মনের খোঁজ দেন।

আর গীতিকার দেন সমাজের প্রা·ের সন্ধান, হৃদয়ের সন্ধান। গীতিকাব্য কবিতাকে সঙ্গীতের পর্যায়ে তুলে ধরে। গানের

কথার মধ্যে প্রকাশ পায় প্রাণের কথা। সূক্ষ্ম শিল্পের যখন আমরা বিচার করি তখন অনেক সময়ে ভুলে যাই যে এরও একটা সামাজিক দিক আছে। কবিতা লেখা, গান গাওয়া, ছবি আঁকা—এসব নিছক অলস কল্পনা বিলাস নয়। মানুষের মানবিক পরিচয়ের এগুলিই সোপান। মানুষের আহার-বিহার, কাজকর্ম, প্রেম-বিবাহ—এসব তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বহিরঙ্গ। কিন্তু মানুষের আশা-অকাঙ্ক্ষার কথা, ভক্তি-প্রেমের কথা—এগুলিই মানুষের বৃহত্তর পরিচয়। শিল্পবোধ এবং রুচিবোধই তার আসল কৃতি। তাই সঙ্গীত সমাজ থেকে পলায়ন নয়, সমাজের প্রতিফলন,—সমাজ-সেবা। মনের দীনতাবোধকে দৈনন্দিন গ্লানির ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার জোর দেয় সঙ্গীত। আবদ্ধ ঘরের তা একখণ্ড খোলা আকাশ।

গানের আলোচনা প্রসঙ্গে এত কথা বলবার প্রয়োজন হয়তো ছিল না। কিন্তু যখন দেখি সাম্প্রতিক বিচারে কালোয়াতি গান এবং সর্বাধুনিক হালকা বাংলা গান যেন আমাদের সমাজের এবং গীতশিল্পের দুই দিকপ্রান্ত, তখন এ প্রসঙ্গ বোধহয় অবান্তর বলে মনে হবে না। সঙ্গীত বরাবরই আমাদের সমাজ আর জীবনের গৌরব বাড়িয়ে এসেছে। ধর্ম-প্রচার থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আশা-আনন্দ হাসি-কান্না সব কিছুই প্রকাশ পেয়েছে গানের মধ্যে। কথায় আর সুরে মিলে সঙ্গীতের প্রধান আবেদন বা উদ্দেশ্য দৈনন্দিন তুচ্ছতা এবং ছোটখাট বিরোধের মধ্যেও মনকে সংযত সংহত শান্ত করা, ঊর্ধ্বমুখী করা। নিছক আনন্দদানই নয়, আনন্দ-লোকে উত্তরণ। রাগ-রাগিণীর রূপকল্পনা এবং সুর-তালের চাল-চলন সেই আভাসই দেয়। এই সনাতন পথের পথিক যে সঙ্গীত তারই সৃষ্টি সার্থক। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানে এই গুণের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। অতি সাধারণ বিষয়ের বিবরণ বা স্থূল উত্তেজনার সঞ্চারই যেন এর কথা ও সুরের লক্ষ্য ; ক্ষণিক উন্মাদনার

সৃষ্টিতেই সার্থকতা। যুদ্ধের সময়ে যেমন রণ-দামামার সঙ্গে সঙ্গে গানের উল্লাস চলতে থাকে,—যুদ্ধের অনুকূলে মনকে তৈরি করাতেই যার সার্থকতা, আধুনিক গান শুনলেও মনে হয় তেমনি কোনো সাময়িক উত্তেজনার সঞ্চারেই এর সিদ্ধি। অধিকাংশ গানেই হয় কথার কোনো গুরুত্ব থাকে না—থাকে শুধু তালে তালে বাজনার ছন্দ, আর নয়তো সুরের কোনো গুরুত্ব থাকে না—গান হয়ে পড়ে বাক্‌সর্বস্ব। তার ফলে সুরে আর বাজনায় মিলে যে বিচিত্র অর্কেষ্টার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে কণ্ঠের কাজও পর্যবসিত হয় কসরতে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে গানের মধ্যে সমাজের রূপ তেমন সিধেভাবে প্রতিফলিত হয় না যেমন হয় গল্প বা কবিতায়। সেইরূপ সাহিত্যও কেবলমাত্র সমাজমনের চিত্রণেই সার্থক নয়। লেখকের অনুভূতির রং তাকে শাশ্বত কালের মর্যাদা না দিলে তা অনবদ্য হয়ে ওঠে না। আর যা অনবদ্য নয় তা কালজয়ী নয়। কালজয়ী না হলে সাহিত্য ঘটনার অনুলেখ বা কল্পনার রঙীন ফানুসমাত্র। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। আমাদের ধর্ম, সমাজবোধ, বিপ্লব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তার ধারা বদলায়, এবং সেই চিন্তার ছাপ সঙ্গীতে পড়ে। সঙ্গীতের ইতিহাসে বরাবরই তা হয়ে এসেছে,—রাজারাজড়াদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত। সেকালের গীতকারদের গানের মধ্যে ধর্মবিপ্লব, সমাজ-সমস্যা, রাজনীতি—এমন কি রাজগুণানুকীর্তনও স্থান পেত। তারপরে স্বদেশী যুগ বা এখনকার অবিশ্বাসের যুগেরও প্রতিবিম্ব পড়েছে গানে। এর যেমন সর্বজনীন আবেদন আছে, তেমনি বিপদও আছে। গান যদি যুগের চাহিদা মেটানোর দিকে নজর দেয় তবে ভাবের স্বর্গ থেকে তার চ্যুতি ঘটে। দলের মন রক্ষা এবং সাধারণের ফরমায়েস মতোই তার চলন-বলন হয়। অথচ সাধারণের খুশি অনুযায়ী গীতরচনাই সার্থক নয়। সাধারণকে

মনে রেখে তাকে সাধারণের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবার সাধনা গানের। তা নইলে রুচি-বিকার অবশ্যম্ভাবী।

তাই ঘটতে চলেছে আধুনিক গানের জগতে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ,—এঁদের গানের মধ্যে একটা আদর্শ ছিল। অন্তরের ভক্তি প্রীতি বাইরে সঞ্চারিত করবার চাবিকাঠি ছিল তাঁদের আয়ত্তে। তাই একের গান দশের হয়ে উঠতে পেরেছে। ব্যক্তির আওতা থেকে তা উঠে এসেছে সমষ্টির সভায়,—ব্যক্তিগত অনুভূতির বৈশিষ্ট্য সমেত। দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেছেন খেয়াল পদ্ধতির বাংলা গান; তাঁর রাগভিত্তিক ছোটবড় বাংলা গান অতুলনীয়। অতুলপ্রসাদ এলেন তাঁর সহজ কবিত্ব, সহজ ভাষা, সহজ ভঙ্গি, নিরভিমান মন নিয়ে,—রচনা করলেন ঠুংরি চালের বাংলা গান,—বাংলা গানের মধ্যে এল হিন্দী ঠুংরির সুর আর বাংলা কাব্যের ভাবমাধুর্য; নানারকমের রাগ-কেন্দ্রিক তাঁর ঠুংরি চালের গান, বাউল কীর্তনের ভাব, ঢং আর সুর। এ দুয়ের মাঝপথে চললেন রজনীকান্ত সেন। বিষয় বৈচিত্র্যে, সুর বৈচিত্র্যে, ছন্দ বৈচিত্র্যে নজরুল ইসলামের গানের ভাণ্ডারও বিরাট। ভারতবর্ষের নানাবিধ সঙ্গীতের মন্দাকিনী ধারা এনে বাংলা গানকে এঁরা পুষ্ট করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইউরোপীয় সঙ্গীতের ছন্দও ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে। আর নজরুল এনেছেন গজল প্রভৃতির ঠাট। বাংলা গানের চরাচর ব্যাপ্ত হল। ব্যাপ্তির শেষ কোঠায় বাংলা গানকে এনে পৌছে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ধ্রুপদ থেকে শুরু করে লোকসঙ্গীতের উচ্ছ্বাস এসে মিশল গানের পারাবারে। শুদ্ধ রাগ ছেড়ে রাগমিশ্রণ, রাগমিশ্রণ পেরিয়ে রাগ-বিবর্তন, ছন্দোবিবর্তন। তারপরে বিদেশী সুর এনে দেশী ছাঁচে ঢালাই করে আসর জমানো। ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, প্রকৃতি সব রূপ-রসের ক্ষীরের সাগর এই রবীন্দ্র-সঙ্গীত। আবার তাও পার হয়ে মরমিয়া অসীম রহস্যময়তায় পাড়ি জমাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। আধুনিক

মনের, আধুনিক গানের উৎসমুখ খুলে দিলেন রবীন্দ্রনাথই। বাংলা গানকে শুধু জাতে তুলেই আনলেন তা নয়, বাংলা গান হল একটা জাতি।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের যে বন্ধন মোচন করলেন তার মূল হল গানের কথাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং সুরকে ভাবের খেলায় লাগান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে তান মান তেলেনা যতই বিস্তার লাভ করুক, সেখানেও কথার অংশ একেবারে নাকচ হয়ে যায় নি। শুধু ঠুংরি টপ্পা নয়, খেয়াল গানেও তার স্বাক্ষর রয়েছে। সুরের একটা ভাবরূপ আছে। কিন্তু শুধু সুর ভেঁজে তাকে যন্ত্রসঙ্গীতের সমগোত্রীয় না করে কথার সঙ্গে সমান চালে চালানোই গানের কাজ। জাতে কাব্য না হলেও সঙ্গীতের মধ্যে কাব্য থাকবেই। তান সহযোগে তাকে শুদ্ধ সাঙ্গীতিক রূপ দেওয়া যায়, আবার তান বর্জিত অবস্থায় দেওয়া যায় কাব্য-গীতিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় রূপারোপের পথ নিয়েছেন। এই থেকেই তাঁর সঙ্গীতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সুরের মিশ্রণ পর্বের সূত্রপাত। দেশী, বিদেশী, শাস্ত্রীয়, লৌকিক—যেখানে যে সুর ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত মনে করেছেন তাই তিনি আহরণ করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা, যার ছোঁয়ায় প্রেম, প্রকৃতি, পূজা থেকে শুরু করে তাঁর সর্ববিধ গানই ব্যক্তি, বিশ্ব এবং অনন্তকে এক যোগসূত্রে গ্রথিত করে দিচ্ছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাই অত্যধিক বাজনা এসে সুরের কণ্ঠরোধ করে না, সুর এসে কথাকে উপেক্ষা করে চলে যায় না, কথা সুরকে একপাশে ঠেলে রেখে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত হয় না। আর, সবার উপরে, শিল্পীর আনন্দ বিশ্বের আনন্দ হয়ে ওঠে, শিল্পীর সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরহস্যের বাণী বহন করে। নিজের সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "গায়কেরা কথা বসিয়ে যান সুর বের করবার জন্য, কিন্তু আমি সুর সংযোগ

করি কথার অর্থকে যথার্থভাবে প্রকাশ করবার জন্য। কথাই সব নয়। বাক্য যা বলতে পারে না, গান তা প্রকাশ করে। সুরের রস এবং কবিতার রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হলেও এদের সুষ্ঠু মিলন হতে পারে। কিন্তু এই মিলনে প্রয়োজন যথোপযুক্ত ওজনবোধের।” আধুনিক গানের ক্ষেত্রে এই ওজনবোধের স্বাক্ষর বড় বেশি মেলে না। হয় কথাগুলি ভারি হয়ে আবৃত্তির সুরে ধ্বনিত হয়, নয়তো সুরের কেরামতি দেখানোই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে পড়ে। দুটোই হয়ে পড়ে কসরতের ব্যাপার। কবি তৃপ্তি পান না সুরের সংযোগে, সুরকার তৃপ্ত হন না কাব্যরূপ নিয়ে, গাইয়ে পান না মুক্তির আনন্দ, শ্রোতা পান না সমন্বয়ের আনন্দ। ফলে কাব্যসৃষ্টি, সুরসৃষ্টি বা গীতসৃষ্টি হলেও একটা পরিপূর্ণ পরিণত সঙ্গীত রসের স্থায়ী সৃষ্টি হয় না।

সহজ ভাবে সহজ কথা বলে সুরের ভক্তি অর্ঘ্যে গানের নৈবেদ্য সাজানোর ভারতীয় বিশেষত্বের দেখা পাই আমরা অতুলপ্রসাদ প্রমুখ গুণীর গানে। দৈনন্দিন জীবনের বেদনা আনন্দ প্রভৃতির ছায়া সেখানেও পড়ে এবং মনকে এই সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে অন্তর-বাহির উজ্জ্বল করে তোলে। আধুনিক গানের মধ্যে সেই আন্তর-দ্যুতির দেখা মেলে না বলে এ গানের আবেদন শুধু সাময়িক। কথার মধ্যে সস্তা উত্তেজনা আর সুরের মধ্যে নিছক চমক, তার সঙ্গে চলে নানান তালের বাজনা, যার তালে তালে অঙ্গের দুলুনি আসতে পারে কিন্তু চিত্তে দোলা লাগে না। আধুনিক গীতকার যেমন হালকা কথায় কোনো একটা মনোবৃত্তির রূপ দেন, আধুনিক সুরকারও তেমনি নানাবিধ হালকা সুরের সংযোগ ঘটান—যার ফলে ভাষার চমক এবং আন্তর্জাতিক স্বর চয়নের কৃতিত্ব প্রকাশ পেলেও গানের চিরন্তন আবেদন রূপায়িত হয়ে ওঠে না।

গান সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না নিশ্চয়। এত সহজে আমাদের মনে আর কিছুতে দাগ কাটে না, আর কোনো

শিল্পেরই এত বেশি করে প্রভাব সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। আমাদের মস্তিষ্ক আর হৃদয়ে—বুদ্ধি এবং অনুভূতির দুয়ারে সোজা এসে হাজির হয় গান। আজকের দিনে কিন্তু গীতশিল্পকে সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। পুরনো আমলে যখন রাজদরবারে সঙ্গীতের এবং সঙ্গীতজ্ঞের স্থান ছিল তখন রাজার মনোরঞ্জন করেও গায়কের স্বাধীন চিন্তার অবসর ছিল। তাঁরা নিজের মনে বসে নূতন নূতন গান এবং সুর উদ্ভাবন করতে পারতেন। লোকসঙ্গীতেরও সেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নি, কেননা তা লোকের মনোরঞ্জন করেই চলত না, সভ্যতার হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই তার বিবর্তন হত; সঙ্গীত মানুষের চৈতন্য জাগিয়ে তুলতেও সহায়তা করত। আধুনিক যুগে সঙ্গীত যখন জনসাধারণের হাতে পড়ল তখন জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তার সেই বৈশিষ্ট্য রইল না। বিগত দুই শতাব্দী ধরে যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, কবির লড়াই প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমরা সঙ্গীতের বিকার দেখতে পেয়েছি। আজকের দিনেও দেখি যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ প্রতিভাবানদের গানের চাহিদা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও সেই অবস্থা। নিজেদের রুচিবোধ বিসর্জন না দিয়ে এবং জনরুচির স্রোতে ভেসে চলতে না পারাতে এঁদের গানের এই সীমাবদ্ধ পরিবেশ। বৈচিত্র্যের অভাবও এই জাতীয় গানের বিরুদ্ধে আর এক নালিশ। বৈচিত্র্য বলতে আমরা কেবলমাত্র নূতনত্বের মোহই নিশ্চয় বুঝি না। অকারণে সুরের উপরে কারিগরি ঘটিয়ে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সমাবেশে গাইয়েদের এবং শ্রোতাদের মতলব অনুযায়ী চলা নিশ্চয় সঙ্গত নয়। অতুলপ্রসাদের কপালে এই দুঃখ লেখা ছিল। তাই আজ তাঁর গান নানা জনে নানা সুরে আর ভঙ্গিতে গাইছেন। অথচ অতুলপ্রসাদের গানের মর্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই এই ধরনের ভুল ভ্রান্তি অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়।

মার্গসঙ্গীতের ঠাট বা ঘরানার মতো এই উপলব্ধিও স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যের দল এখানো বর্তমান থাকতে মতভেদ মিটিয়ে নেওয়া তেমন কঠিন বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ এদিকে দিয়ে কিছুটা ভাগ্যবান। তাঁর গানের পিছনে সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গ আছেন, তাঁর জীবদ্দশা থেকেই সুষ্ঠু পদ্ধতিতে পরিচালিত শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত শিক্ষার ঐতিহ্য রয়েছে, একটি সঙ্গীত ও স্বরলিপি সমিতিও রয়েছে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে সহায়তা করবার এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত জগতের উপরে নজর রাখবার জন্য। এঁদের মধ্যে মত পথ বিবাদ বিসম্বাদের অবসান এবং পারস্পরিক কার্যকরী সহযোগিতা ঘটলেই রবীন্দ্র-গীতজগৎ নিরঙ্কুশ হতে পারে। কোনো গানের মধ্যে সুরের কারিকুরি দেখাবার ইচ্ছা অনেক কারণেই হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার অভাব বা সুরের মর্ম গ্রহণের অক্ষমতা যদি এর কারণ হয় তবে ঠিকমত শিখে নিলেই তা দূর করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গাইয়ের নিজের সুর-জ্ঞানের তুলনায় গীত গানের সুরকে অসম্পূর্ণ মনে করে অথবা সুরটিকে খেলিয়ে আরো বেশি করে প্রকট করবার চেষ্টায় গানের সুরে পরিবর্তন করার ইচ্ছা হয়। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যে, গীতকার এবং সুরকারের একটা পরিমিতি থাকবেই। বিশেষ করে সেই দুই গুণ যখন একই ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। কেন না, কাব্যরূপের মেজাজ অনুযায়ী সুরযোজনা সুষ্ঠু এবং যথার্থভাবে তিনিই করতে পারেন যিনি একাধারে কবি ও সুরকার। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতের জগতে গীতকার প্রচুর, সুরকার প্রচুরতর। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জনগণের নানান ধরনের রুচির চাহিদা। রুচির হাট বসে গিয়েছে। তার মধ্যে সমাজের রূপ তলিয়ে গিয়েছে, পড়েছে পলিমাটির প্রলেপ। সিনেমাতে, রেডিয়োতে,

রেকর্ডে, জলসায় যে বিচিত্র সুর-চাতুরীর খেলা চলছে তার 'তরঙ্গ রোধিবে কে'। একে তো আজকের দিনে কর্মব্যস্ত মানুষের সময় নেই, তার উপরে আর্থিক, রাজনীতিক নানান বিপর্যয়। এর মধ্যে ক্ষণিক আনন্দ বা সাময়িক সুখই কাম্য। চট করে একটু আমোদ করে নিতে হবে; সময় নেই। সমাজের কাঠামোটাই ভেঙে যেতে চাইছে, পালটে যাচ্ছে। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, এ সবের জায়গা কোথায়? তাই সস্তা চটুল জিনিসের দিকে আজকের শ্রোতা এবং উপভোক্তাদের ঝোঁক। এই রকম যেখানে অবস্থা, সেখানে সংস্কৃতি, কৃষ্টি, রুচি,—সব বিসর্জন দিয়ে স্রোতের তালে গা ভাসিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু তবু দেখা গিয়েছে গা ভাসিয়ে দিতে মানুষ পারে না। সাময়িক মোহ কেটে যায়, যা ছিল নূতন তা একঘেয়ে হয়ে যায়। কিন্তু চিরনূতন একঘেয়ে হয় না। একথা আমরা যে বুঝি না তা নয়। সিনেমার ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা হাটে-মাঠে চায়ের দোকানে শুনতে পাই, অথচ সিনেমাতে কোন ধরনের রুচি চালু হওয়া উচিত বুঝতে পেরেও সস্তা সিনেমাতে ভিড় কমে না। কান-ফাটানো মাইকধ্বনির বিরুদ্ধে মত দিয়েও যেমন আবার সেই মাইক চালিয়ে পাড়ার প্রাণ ওষ্ঠাগত করা। আজকাল সিনেমা এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে সাহিত্য ও সঙ্গীত হয়ে উঠেছে ফরমায়েসি। আমাদের শুভবুদ্ধি এবং বিকৃত বুদ্ধি একই সঙ্গে বাস করে। বিকৃত রুচিটার প্রকাশ সহজ। তাই সাধারণের উত্তেজনাপূর্ণ চাহিদার এইটাই রূপ। সুতরাং পরিবেশক এবং পরিচালকদের সচেতন হওয়া উচিত। গলিতে গলিতে পার্কে সিনেমা-মঞ্চে যাঁরা একটার পর একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন তাঁদের উদ্দেশ্য যদি মুরুব্বিয়ানা বা অর্থোপার্জন না হয় এবং সুরুচির সংরক্ষণ ও প্রসার লক্ষ্য হয় তবে সমগ্র শিল্পজগতের কিছু পরিবর্তন হতে পারে। আজকালকার অবসরহীন জীবনে পঞ্চ ব্যঞ্জনের নানাবিধ আহার্য একসঙ্গে চেখে

দেখার মত সাহিত্য এবং সঙ্গীতেও এক খাবলা এটা, এক খাবলা ওটা, আস্বাদনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। সঙ্গীতকে নিছক অবসর বিনোদনের সামগ্রী মনে করাতেই তার এই হেলাফেলা। আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেও এই ভাবটাই থাকে। যে গানের জন্য যাঁর খ্যাতি তাঁকে যথাযথ পরিবেশনের সুযোগ দেওয়াই সঙ্গত এবং সঙ্গীতের ক্রম ও পর্যায় অনুযায়ী নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার মত কার্যসূচী প্রস্তুত করা কর্তব্য। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে সব আসর বসে তার মধ্যে বরঞ্চ এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। সে গানের মধ্যে কেবলমাত্র সস্তা সময় কাটানোর রস নেই। আছে শিল্পরস। কীর্তন, বাউল প্রভৃতি গানের মধ্যেও সেই রস আছে। কিন্তু অন্যত্র তার সাক্ষাৎ মেলা কঠিন। কোনো কোনো গানে রাগাশ্রিত বা মিশ্ররাগের মাধুর্য আছে তো কথার মধ্যে কবিত্ব বা ভাবের সংস্রব নেই। আবার কোনো গান কথায় ভারি তো সুরে ছন্দে বাজনায় অসহ্য। এই অবিশ্বাসী যুগের অস্থিরতা যেন গানের মধ্য দিয়ে আর্ত চিৎকারে পরিত্রাণ খুঁজছে। সঙ্গীতের মধ্যে যে-জীবনবোধ বা জীবনী-রস থাকবার কথা তা নেই বলে উদ্ধারের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

পরিশেষে একটি কথা বলি। আধুনিক গানের যৎপরোনাস্তি নিন্দা বা রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে অতিমানবীয় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সব কিছুরই মতো আধুনিক সঙ্গীতেরও বিভ্রান্তির বা বিমূঢ়তার ভাব এসেছে। কল্যাণ চাই কিন্তু পথটা ধরা যাচ্ছে না। খারাপ এবং ভাল সব যুগেই পাশাপাশি থেকে এসেছে এবং থাকবে। কিছু পরিমাণ ভালর দিকে ঝুঁকবে, কিছু পরিমাণ নিচের তলায় তলিয়ে যাবে। সব দেশ এবং কালেরই এই ইতিহাস। তবু সমষ্টির কল্যাণ কখনোই সমষ্টির বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে হাল ধরতে হয়, এবং অনেক কষ্ট করে অনেক বিরুদ্ধ

ঢেউ-এর মধ্যে চলতে হয়। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গান এখনো তার মধ্য দিয়ে যায় নি। কবিত্বময় গীতকার, প্রতিভাবান সুরকার এখনো যে আমরা না পেয়েছি বা না পাচ্ছি তা নয়। কিন্তু নিজেকে নিজের সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম করে নিতে কেউ পারেন নি। তার কারণ অনেকাংশেই জীবন সংগ্রাম,—যদিচ শিল্পের ইতিহাসে দেখা যায় স্রষ্টারা সকলেই কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন কি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও শিল্পকে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কারণ যাই হোক, এর ফলে আমরা ছাড়া ছাড়া ভাবে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখেছি, কিন্তু ধারাবাহিক অগ্রগতি লক্ষ্য করি নি। রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা গানের কতকগুলি বিশিষ্ট দিক আছে নিঃসন্দেহ। নিধুবাবু থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ঐতিহ্য তার ফলে গানের গতানুগতিকতার বন্ধন মোচন হয়েছে। বাংলা গানকে যাত্রার পালা, কথার মারপ্যাঁচ বা সুরের কারিগরি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিয়ে আসবার প্রথম চেষ্টা রামনিধি গুপ্তর মধ্যেই বোধহয় আমরা লক্ষ্য করি। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির আমেজভরা নানাবিধ গান। বিশেষ করে প্রেমসঙ্গীতে তাঁর বিশেষত্ব। সেই স্বাতন্ত্র্য আরো স্পষ্ট হতে হতে পূর্ণ বিকশিত হয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। আধুনিক তম বাংলা গানেও কখনো কখনো কথার এবং সুরের এই বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। নূতন নূতন সুর নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মার্গসঙ্গীতের সুরের কোনো একটা অংশকে টেনে নিয়ে কথার রং লাগিয়ে তাকে বিচিত্র করে তোলা হচ্ছে। মিশ্রণ ব্যাপকতর হয়েছে এবং বাংলা সুরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সুরের জাল বোনা শুরু হয়েছে। কখনো তাতে জট পাকিয়ে যাচ্ছে, হাস্যকরও হচ্ছে বুঝিবা, তবু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। গানের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার উপলব্ধির এও একটা উপায় সন্দেহ নেই। তাছাড়া যন্ত্রসঙ্গীত যেখানে অনেকটা একক দাঁড়িয়ে ছিল সেক্ষেত্রেও নূতন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। একদিকে যেমন সমবেত যন্ত্র-

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নানারকম সৃষ্টি চলছে, তেমনি চলছে গানের সঙ্গে এই যন্ত্রমণ্ডলের মিলন। এই সব যন্ত্রবাদন যদি মূল গান গানকে, গানের কথা ও সুরকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে না চলে যায় তবে এও এক সাঙ্গীতিক অবদান নিঃসন্দেহ। ওস্তাদী গানের সঙ্গে চলে তানপুরা, সারেঙ্গি, তবলা। আমাদের লোকসঙ্গীতে একতারা, দোতারা, তবলা। আসরে জলসায় নানাবিধ গানের অনুষঙ্গ—খোল, কর্তাল, ঢোলক, মৃদঙ্গ, কত কি। শেষে যখন হারমনিয়মের সৃষ্টি হল তখন সেই যন্ত্র-খাতে না চলেছে এমন গান নেই। হারমনিয়মে শ্রুতি ধরে না বলে এবং কাটা কাটা সুর হয় বলে ওর ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকেই পছন্দ করতেন না। ইদানীং থিয়েটার এবং ইউরোপীয় হাওয়া-লাগা যাত্রার আসরে 'ব্যাণ্ডো' বেজেছে, অর্থাৎ পিআনো, অর্গান, বাঁশি, ক্লারিওনেট, বেহালা প্রভৃতি হরেক রকমের বিদেশী যন্ত্রকে গানের সাগরেদিতে লাগান হল; তাতে নাটকীয় রস জমল ভাল। অবশেষে আরো কত রকমের বাজনা এসে যে গানের আসর সরগরম করল তার হিসেব জটিল। রবীন্দ্রনাথ গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজানো পছন্দ করতেন। এস্রাজে সারেঙ্গির মতো সুরের সূক্ষ্মতম পর্দা পর্যন্ত ধরা পড়ে। সম্প্রতি প্রায় সবরকম গানের সঙ্গে চলছে গীটার। গীটারের একটা সুবিধে আছে, যন্ত্র হিসেবে একে দ্বিতীয় সারিতে বসানো উচিত কিনা সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে এতে তবলার সঙ্গতের বিকল্পে ছন্দের কাজ চলে যায়, এবং সেই সঙ্গে সুরের দোলা এবং মীড়ও তোলা যায়। এমনি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নানারকম যন্ত্র সমাবেশে গান একটা নূতন প্রকাশের ভঙ্গি আয়ত্ত করছে। সুর এবং ছন্দের বিচিত্র সমারোহ গানকে আরেক ধরনের মাধুর্য দেবে তাতে সন্দেহ কি। সব কিছুর সমাবেশে যখন সঙ্গীত তার ভাবরূপ বজায় রেখেও আমাদের নিয়ে যাবে চিরন্তন আনন্দলোকে তখন রবীন্দ্র-

প্রভাব মুক্ত বাংলা গানও নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সার্থক হবে আপন রুচিবৈশিষ্ট্যে। 'ভাবরূপ' বজায় রাখবার কথাটা প্রণিধানযোগ্য। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে শুধু আমাদের জীবন-ধারারই নয়, আমাদের প্রাকৃতিক এবং প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক এবং স্বভাবগত পার্থক্য। ইউরোপীয় সঙ্গীত যেখানে বাইরের জীবনটুকু নিয়ে কারবার করে, গানের কাঠামোর দিকে বেশি নজর দেয়, আমাদের সঙ্গীতে তার বদলে লাগে প্রাত্যহিক এবং কালাতীত জীবনের সুর। আমরা সুখে দুঃখে গান করি, ফসল ফলাতে, নৌকা বাইতে গান করি, অথচ তার মধ্যেও সঙ্গীত আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জীবন থেকে আত্মাকে দূরাশ্রয়ী করে। অর্থাৎ সঙ্গীত আমাদের কাছে লোকোত্তর বা লোকাতীত অনুভূতি। তাই গানের মধ্যে সেই অনুভূতির ছোঁয়াটুকু না থাকলে গান প্রাণ পায় না। ব্যবহারিক জীবনের গান বাইরেই থেকে যায়, আমাদের অন্তর্জীবনে প্রবেশের পথ পায় না। এই পথটা খুঁজে না পেলে আমাদের 'আধুনিক' গানের দীনতা ঘুচবে না।